দশ নম্বর ঠাকুরদাস পালিত লেন,
কলিকাতায় অবস্থিত সুমুদ্রণ
থেকে ছেপে পাঁচ নম্বর শ্যামাচরণ দে
স্ট্রীট, কলিকাতায় অবস্থিত বুক ব্যাঙ্ক
থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীসুধাংশু বক্সী।

উৎসর্গ পত্র

পূজনীয়া

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

শ্রীচরণে।

শ্রীকালিদাস নাগ

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৪

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলি যখন কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখনই আমার মনে একটা বাসনা লালিত হচ্ছিল। সে বাসনাটি হ'ল ঐ প্রবন্ধগুলির সমাহার ঘটিয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করা। কেননা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ছাত্রবৃন্দের নিকট তথা রবীন্দ্রানুরাগী মাত্রেরই নিকট এরূপ গ্রন্থ যে এক অমূল্য সম্পদরূপে স্বীকৃতি পাবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। এ ছাড়াও আর একটি লোভ ছিল, তা' হ'ল এ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট সংস্কৃতিবিদ্ ডক্টর কালিদাস নাগ মহাশয়ের একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা। যিনি কবির স্নেহ-ছায়ায় অনেক দিন যাপন করেছেন এবং কবির প্রিয় ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এই কারণে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত বিষয়সমূহ যে বিশেষ তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ হবে সে বিষয়ে স্থির নিশ্চয় ছিলাম। আজ সেই বহুদিনের আশাকে রূপায়িত করে শুভ পঁচিশে বৈশাখে, রবীন্দ্রানুরাগীদের হাতে তুলে দিলাম। গ্রন্থটি তাঁদের মানসিক তৃপ্তি বিধানে সক্ষম হ'লেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করব। বইটি প্রকাশের স্বীকৃতি দিয়ে ডক্টর নাগ আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন নিঃসন্দেহে। তাঁকে ধন্যবাদ দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই। এই প্রসঙ্গে আর একজনের সহায়তার কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি। তিনি হ'লেন বন্ধুবর শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীসুধাংশু বক্সী

২৫শে বৈশাখ

৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

গ্রন্থকারের নিবেদন

যে প্রবন্ধ চারটি এই পুস্তিকায় সন্নিবেশ করা হ'ল, এগুলি ইতি-পূর্ব্বে সযত্নে ছেপেছিলেন মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকা মহশয়গণ। তাঁদের আজ আমার সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাই। আর সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই 'রূপাঞ্জলি'-সম্পাদক শ্রীসুধাংশু বক্সীকে, যিনি আমার লেখাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ ক'রে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে সাধারণকে উপহার দিলেন।

প্রকাশের আগে যাঁদের কাছ থেকে নানাভাবে আমি সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে স্মরণ করি শান্তিদেব ঘোষ ও পুলিনবিহারী সেন, শুভ গুহ-ঠাকুরতা, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, অমল মিত্র ও তমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এঁদের সঙ্গে দেশের সব রবীন্দ্র ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানাই, যেন তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় রবীন্দ্র-জন্ম-শতাব্দী উৎসবের পূর্ব্বে পূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য ও সঙ্গীতভাষ্য সমেত **রবীন্দ্র-পদাবলী** জনসাধারণের জন্য প্রকাশকরা হয়।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগে যাঁদের সঙ্গে রবি-কীর্ত্তন সুরু করেছিলাম, আজ দেখি তাঁরা অনেকেই পাশে নেই ; অথচ তাঁদের স্থান পূরণ হয় না—তাঁদেরও স্মরণ করি : রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভাণ্ডারী ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ৺অতুলপ্রসাদ সেন, ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ৺সুকুমার রায়, রমা কর, অমিতা সেন আরো কত আত্মীয়দের। শুধু এইটুকু সৌভাগ্য যে, এঁদের মধ্যমণি হয়ে আজও আছেন পূজনীয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। এই প্রবীণ বয়সেও আমাদের সাহায্য করতে ও প্রেরণা দিতে তাঁর কী উৎসাহ! সেই দাক্ষিণ্যের ঋণ শোধ করতে না পারলেও তাঁরই করকমলে "সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ" নিবেদন করলাম।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৪
রবীন্দ্রাব্দ ৯৭

শ্রীকালিদাস নাগ।
রবীন্দ্র শতাব্দী সঙ্ঘ।

সূচীপত্র

"সুরের গুরু, দাওগো সুরের দীক্ষা,

মোরা সুরের কাঙাল এই আমাদের ভিক্ষা ॥

মন্দাকিনীর ধারা, ঊষার শুকতারা,

কনকচাঁপা কানে কানে যে সুর পেল শিক্ষা ॥

তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত

যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।

কোলাহলের বেগে ঘূর্ণি উঠে জেগে,

নিয়ো তুমি আমার বীণায় সেইখানেই পরীক্ষা ॥"

ভানুসিংহের পদাবলী

(১)

রবীন্দ্রনাথের সুর-ধর্ম্মী রচনাবলীর মধ্যে "ভানুসিংহ" ও "রবিচ্ছায়ার" স্থান ও তাৎপর্য্য নিয়ে কিছু আলোচনার সূত্রপাত করছি। যোগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র মহাশয় ১২৯২ বৈশাখে (১৮৮৫) হয়ত কবির ২৪ বর্ষ-পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে রবিচ্ছায়া ছেপেছিলেন। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত "পদরত্নাবলী" বেরিয়েছিল (আদিব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে)। তার কিছু আগে (জুলাই ১৮৮৪) "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" দেখা দিয়েছিল সেই একই আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে। ছোট্ট বইখানির উপরে দেখি "শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত"; বিজ্ঞাপনে 'প্রকাশক' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "ইহার অধিকাংশই পুরাতন কালের খাতা হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।" সেই ১২৯২ সালেই "নবজীবন" পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় কবি "ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী" নামক ব্যঙ্গ-প্রবন্ধ বেনামীতে ছেপেছেন:

"ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়ি বাবু বলেন ভানুসিংহের জন্মকাল খৃঃ ৪৫১ বৎসর পূর্ব্বে...আবার কোন কোন মূর্খ নির্ব্বোধ গোপনে আত্মীয়

বন্ধু-বান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ভানুসিংহ ১৮৬১ সালে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন। ("নবজীবন" ১ ভাগ ১ সং)।

'ধরাধাম উজ্জ্বল' করেই গেছেন কবি। কিন্তু 'পরিহাস-কেশবে'র প্রিয়শিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর "রবিচ্ছায়ায়" আমাদের দৃষ্টি ধাঁধিয়েও গেছেন : দিনকে মনে হয়েছে রাত, তরুণ প্রভাতী-রাগিণীর মধ্যেই প্রবীণ রাত্রির প্যারোজ-আলাপ করে তিনি যেন আমাদের বিভ্রান্তও করেছেন, যেন মেঘনাদের সঙ্গে অলক্ষ্য যুদ্ধ। বহু বেনামী রচনা—তাঁর স্বাক্ষরের অভাবে,—রবীন্দ্রনাথ রচিত বলে—আজ আমরা আর সঠিক জানতে পারব না। কিন্তু ভানুসিংহের বেনামদার 'প্রকাশক' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা জানি এবং ধরেছি। কারণ সযত্নে ধরা দিতেই যেন তিনি এগিয়ে ছিলেন। ভক্ত বেচারীদের বিভ্রান্ত করার শিল্পকলা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ; সেটি ৩০ বছর ধরে দেখে এসেছি। তাই সেই সুদূর কালের "মেঘের কোলে রৌদ্র ছায়ায়" লুকোচুরী খেলায় যোগ দিতে পাঠকদের আহ্বান করি।

মেঘ ও রৌদ্রের অনেক ছায়া ও আলো খেলে গেছে "ভানু-সিংহের" উপর। কিন্তু, এত ঘটা করে তাঁর প্রথম ও শেষ "পদাবলী" ছাপিয়ে, পরে পরিণত বয়সে কবি নিজেই আবার তার অনেক প্রতিকূল সমালোচনাও করেছেন। তাই শুধু 'ভানুসিংহ' নয় অন্য কিছু "অচলিত" রচনা নিয়েও ঝগড়া আমাদের আছে কবির সঙ্গে। 'ভানুসিংহ'কে প্রাচীন পদকর্তা বলে প্রমাণ করে নিশিকান্ত

চট্টোপাধ্যায় "ডকটরেট" পান—এ নিপুণ পরিহাস উপভোগ্য। নিশিকান্ত যখন জার্ম্মাণী ও রাশিয়া ভ্রমণে ব্যস্ত, (১৮৭৭—৭৮ সালে) তখন ১৬ বছরের তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ যাবেন বিলাতে ; তাই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য তাঁর পাঠে যত কিছু ত্রুটি ছিল, তার যেন প্রায়শ্চিত্ত করছেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম পর্ব্ব বন্ধ হতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী থেকে "ভারতী" বার হল (১২৮৪) ; তার মধ্যে Anglo-Saxon ও Anglo-Norman সাহিত্য নিয়ে কবি প্রবন্ধ লিখছেন ও আশ্চর্য্য নিপুণতার সঙ্গে বাংলায় অনুবাদ করে চলেছেন সে সব খাঁটি প্রাচীন ইংরেজী কবিতা। তার মধ্যে অক্ষয় চৌধুরীর কাছে শুনছেন Chatterton নামে এক ছোকরা-কবি জ্যাঠামী করে অমর হয়ে গেছেন প্রাচীন কবিদের অনুকরণ করে! আর রবীন্দ্রনাথকে পায় কে ? তিনি "কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।"

কিন্তু মনে রাখা উচিত যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনে ও বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসে পদাবলী উদ্‌ধৃত করেছেন ; তাঁর "এস এস বঁধু এস" বৈকল্পিক পদের (variant) আবিষ্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কমলাকান্তের মত ভানুসিংহের জবানবন্দী শুনেই বলতে ইচ্ছা করে—"ইহ বাহ্য আগে কহ আর" ! চ্যাটার্টন ছেড়ে চণ্ডীদাসের বাংলায় দেখতে চাই আজ রবীন্দ্রনাথকে, কারণ সেভাবে দেখেই হয়ত সঠিক বোঝা যাবে ভানুসিংহের আবির্ভাব। বিলাত যাত্রার তাগিদে Tennyson, Moore, Chatterton ইত্যাদি পড়বার অনেক আগেই কবি লুকিয়ে সুরু করেছেন পদ-বৃন্দাবনে তাঁর

অভিসার। সেই রবীন্দ্রনাথকেই "দূতী" করে পাঠকরা এগিয়ে চলুন "ভেকধারী" ভানুসিংহের সন্ধানে :

"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন আকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট্ লইয়া লিখিলাম—

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে—
বিসরি ত্রাস লোক লাজে—
সজনি, আও আও লো।

সেই মেঘে-ঢাকা মধ্যাহ্নের তারিখ আর জানা যাবে না, কিন্তু তার ছাপ আমাদের বুকে রেখে গেছেন ভানুসিংহ। হতেও পারে এইটি তাঁর পদাবলীর প্রথম রচনা : কিন্তু পুরান ভারতীর পাতা উল্টে দেখি ১২৮৪ সালে আশ্বিনে "ছাপা" প্রথম পদ—

সজনী গো, শাওন গগনে ঘোর ঘন ঘটা
আঁধার যামিনী রে
কুঞ্জপথে সখি কৈসে যাওব
অবলা কামিনী রে

মল্লার রাগিণীর মীড় কেঁপে কেঁপে উঠছে। আজও শুনলে বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এ সুর তাঁরই দেওয়া—ধার করা নয়। ষোল বছরের রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির পদে প্রথম যে সুর দিয়েছিলেন চন্দননগরের গঙ্গাতীরে, তাতেও মেঘ-মল্লারের পাকা আলাপ। কিন্তু তারও চেয়ে ছোট বয়সের কৃষ্ণ-যাত্রায় শেখা ঝিঁঝিট সুর বেঁধে

রেখেছেন কবি (অগ্রহায়ণ ১২৮৪) পদাবলীর দ্বিতীয় গানে—"গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে।" রচনাটি ১৬ বছর বয়সের হতে পারে; কিন্তু হয়ত ছয় বছরের শিশু-রবি এই ঝিঁঝিট-সুর কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন কোন ও এক যাত্রা পালা শুনে—যার বর্ণনা পাই "ছেলেবেলায়।" সে বয়সে রবীন্দ্রনাথ হয়ত নামে সুর চেনেন না কিন্তু কাজে সুর ধরতে তাঁর মত কে পারত? এই শিশু-কলাবিদের কান বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সেটি মনে করিয়ে দেবার জন্যই দু'চার কথা লিখছি। এই সুরস্বর্গের শিশুকে চিনেছিলেন তাঁর পিতৃদেব ও পিতৃবন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহ যিনি তাঁকে সঙ্গে করে বেড়াতেন আর, 'নন্দ-বিদায়' যাত্রার জুড়ি-গানের মতন, সবাইকে শোনাতেন "ময় ছোঁড়ো ব্রজ কি বাস রে।" সেই অতটুকু বয়সেই শিশু-রবি সুরের সঙ্গে আয়ত্ত করছেন ব্রজমাধুরী ও "ব্রজবুলি"।

সে আর এক ইতিহাসের পর্ব্ব; কারণ ভানুসিংহ বোধ হয় আধুনিক বাংলার শেষ পদকর্ত্তা; সে মর্য্যাদা তাঁকে আমাদের দিতে বাকী আছে তাঁর বয়সের তারুণ্য ভুলে। যাত্রা-পাঁচালী শোনার ভিতর দিয়ে অনেক কিছু তিনি আয়ত্ত করেছেন, তার ভাঙ্গাচোরা ইসারা রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়ে গেছেন। "জল পড়ে—পাতা নড়ে" শীর্ষক কবিতার মধ্যেও তাই তিনি ছন্দ আবিষ্কার করেছিলেন। সুতরাং মাত্রা, তাল ও সুরে তাঁর জন্মগত অধিকার, সাধারণ শিক্ষায় ত্রুটি যতই থাক না কেন। ১২৮০তে ১২ বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ পড়ছেন দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের "স্বপ্ন প্রয়াণ", শুনছেন গীতগোবিন্দের বিচিত্র

ছন্দ প্রবাহ, জেগে উঠছে কবি হবার "অভিলাষ", কানে শুনছেন "প্রকৃতির খেদ" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত নাম-হারা, রচনা) তাঁর প্রথম নদী-গাথা।

১২৮১তে শুরু হল "প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ" এবং দু'বছর ধরে (১২৮১-৮৩) ছাপা হল (১) বিদ্যাপতি (২) চণ্ডীদাস (৩) গোবিন্দদাস (৪) রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ (৫) কবি কঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল। সম্পাদনায় প্রধান উদ্যোক্তা অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) ও প্রবীণ সাহিত্যিক সারদাচরণ মিত্র, যাঁর বিদ্যাপতির "ভূমিকা" আজও পড়ে অনেকে লাভবান হবেন। ১২৮১তেই দেখি বালক-রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাক্ষরিত কবিতা "হিন্দুমেলায় উপহার" পড়া হয়েছে ও অমৃত বাজার পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। (১১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৫) কিন্তু এ সব কবিতার আগেই দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "পুরুবিক্রম" ও "সরোজিনী" নাটকে দু'টি গান রচনা করে জুড়ে দিয়েছেন। কবিতা লেখার চেয়ে গান গাওয়া, সুর ধরা ও পদাবলী রচনায় রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ বেশী বই কম হতে পারে না। বঙ্কিম সম্পাদিত বঙ্গদর্শন (১ম পর্ব্ব) বন্ধ হতেই 'ভারতী' প্রকাশের (১২৮৪ শ্রাবণ) সঙ্গেই দেখি বালক-রবি দাদাদের সম্পাদকীয় বৈঠকে 'প্রমোশন' পেয়েছেন : সেই দাদাদেরই কাছ থেকে তাঁর "লোভের সামগ্রী"—প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহগুলি তিনি তন্ন-তন্ন করে পড়েছেন এবং রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতে এই ১২৮৪ বর্ষাকাল থেকেই "ভানুসিংহের

পদাবলী" রচনা শুরু হয়। ঐ বছরে (১২৮৪ আশ্বিন-চৈত্র) সাতটি, ১২৮৫তে (বৈশাখ) একটি "বার বার সখি বারণ করনু" (ইমন কল্যাণ) ১২৮৬ বৈশাখ "মাধব না কহ আদর বাণী" (বাহার) ও ১২৮৭ বৈশাখ, "দেখলো সজনী চাঁদনি রজনী (বেহাগ) কবির বিলাত প্রবাসকালে ছাপা হয়। বিলাত-যাত্রার আগে ছাপা গান : বাজাও রে মোহন বাঁশী (মূলতান), হম সখি দারিদ নারী (ভৈরবী), সখি রে পিরীত বুঝবে কে ? (টোড়ী) ; সতিমির রজনী সচকিত সজনী (মিশ্র জয়জয়ন্তী), বাদর বরখন নীরদ গরজন (মল্লার)। প্রবাসকালে ছাপা গানগুলিতে রাগ-রাগিণী রবীন্দ্রনাথ নিজে বসিয়ে গিয়েছিলেন অথবা তাঁর দাদারা বসিয়েছেন, আজ স্থির করা কঠিন। কিন্তু বিদ্যাপতির "ভরা বাদর" পদে যিনি অপূর্ব্ব সুর-বিন্যাস করেছিলেন ১৬ বছর বয়সে—সে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভানুসিংহে'র সব পদেই পছন্দ মত সুর দেওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয় ; বিশেষ যখন দেখি যে, 'পদাবলী'র বেশীর ভাগ গানেই তাঁর প্রিয়তম রাগিণীগুলিরই সমাবেশ, যথা :—ভৈরবী, টোড়ী, ললিত, খাম্বাজ, কল্যাণ, দেশ মল্লার, বেহাগ (মিশ্র) বাহার, শঙ্করা ইত্যাদি। শেষ পদটি আজকাল খুব গাওয়া হয়—সবাই জানেন তাই "ভানুসিংহ" সুর-সমস্যার একটু নমুনা দিয়ে গাইয়েদের সতর্ক করতে চাই।

১২৮৮ (শ্রাবণে) অর্থাৎ প্রায় ৭০ বর্ষ আগে রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরেই ভারতীতে ছাপেন :

মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঝ মেঘ জটাজুট
রক্ত কমল কর রক্ত অধর পুট,
তাপ বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান'
তুহুঁ মম শ্যাম সমান ॥

এই গানে এবং শেষ পদ "কো তুঁহু বোলবি মোয়" গানটিতে তখনও রাগ-নির্দ্দেশ করেননি। ১২৯১ (১৮৮৪ খৃঃ) সালে যখন 'পদাবলী' ছাপলেন তখন "মরণ রে তুহুঁ মম" গানেতে পূরবী সুর দিয়েছিলেন," অথচ ১২৯১ (১৮৮৫) যখন "রবিচ্ছায়ায়" গানটির পুনর্মুদ্রণ হল তখন পূরবী বদলে "ভৈরবী"র বেদনাবিধুর মাধুর্য্য রবীন্দ্রনাথ ঢেলে দিয়েছেন; সুরের খেয়ালী রবীন্দ্রনাথ এমনি কতবার নব নব মীড় ও মূর্চ্ছনায় আমাদের মুগ্ধ করেছেন, জেনেছি, শুনেছি বলেই, আজ সজাগ করাতে চাই তাঁদের, যাঁরা রবীন্দ্র সুর-সাগরে অবগাহন করে ধন্য হতে চান। স্বরলিপি করা ছিল সেকালে কঠিন; বেশী পাওয়া যায়নি এ-পর্য্যন্ত। অনেক সুরই আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে হারিয়ে গেছে। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীর ও ৺দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একান্ত যত্নে তার কিছু রক্ষা পেয়েছে। আর সেদিন কিছু সন্ধান পেলাম কবির মনস্বিনী ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবীর পুত্র তপস্বিনী চৌধুরীর কাছ থেকে। 'সাধনা' ও 'সঙ্গীত সঙ্ঘে'র প্রতিষ্ঠার সময় থেকে "আনন্দ সঙ্গীত" ও অন্য পত্রিকায় প্রতিভা দেবী ও ইন্দিরা দেবী কী গভীর

অনুরাগ ও নৈপুণ্যের সঙ্গে সেই আদিকালের "ভানুসিংহ" "বাল্মীকি-প্রতিভা" "কালমৃগয়া" ইত্যাদির গান লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। সেকালের সঙ্গীত-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি ভাল করে নাড়লে হয়ত আরো নূতন দলিল পাওয়া যাবে।

কিন্তু নাট্যাভিনয়াদিতে সঙ্গীত প্রয়োজনা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আর এক বিরাট অধ্যায়; সে আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য রেখে আজ "পদকর্ত্তা"—ভানুসিংহ ও রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব সাহিত্যে বিচক্ষণতা নিয়ে কিছু বল্‌ব।

১৮৮১ সালের (১২৮৮) ভারতীতে যে শ্রাবণ মাসে 'মরণ রে' গানটি ছেপেছেন, সেই সংখ্যায় দেখি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিদ্যাপতির তীব্র সমালোচনা (যেটি রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদ বধ সমালোচনা ১৮৭৭—মনে করিয়ে দেয়।)। ঠিক একমাস পরে (ভাদ্রে) দেখি তার "উত্তর-প্রত্যুত্তর : অক্ষয় পক্ষে তাঁর বন্ধু শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও বিপক্ষে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ! সেই ২০ পাতা ব্যাপী আলোচনা যাঁরা পাঠ করবেন তাঁরা কুড়ি বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথের পদাবলী-সাহিত্যে অধিকার দেখে অবাক হবেন। 'বিলাত-ফেরতা' হওয়া ত দূরের কথা (ইউরোপ প্রবাসীর পত্র তার প্রমাণ) রবীন্দ্রনাথ যাত্রার বহু পূর্ব্বে,—শৈশব কাল থেকেই যে পদাবলী পড়ে আসছেন, তার ভাব ও ভাষায় বিশুদ্ধতা রক্ষায় রবীন্দ্রনাথের কী একাগ্র চেষ্টা ও নিষ্ঠা! তিনি নিজে আমাদের বলেছেন প্রত্যেক পদ শুধু নয় প্রত্যেক শব্দটির "নির্ঘণ্ট" নিজ

হাতে বাল্যাবস্থায় তিনি করেছিলেন। তাই অক্ষয়চন্দ্র যেখানেই গোঁজামিল-ব্যাখার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ অন্য পদকর্তাদের parallel passage থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আসল অর্থ বার করতে চেষ্টা করেছেন। এইখানেই "শব্দতত্ত্ব" রচনার যেন সূচনা দেখি। "শাব্দিক" রবীন্দ্রনাথকে বন্ধুবর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় "বাক্‌পতি" বলে অর্ঘ্য দিয়েছেন। আজ তাই আমরা নতুন চোখে তাঁর "ভানুসিংহ" ও ব্রজবুলী প্রয়োগটি বুঝতে চেষ্টা করা প্রয়োজন বোধ করছি। ১৮৮২তে গ্রীয়ারসন * (Grierson) সাহেব Vidyapati and Maithili Chrestomathy (Asiatic Society of Bengal 1882) প্রকাশ করেন। সে বইখানি তন্নতন্ন করে রবীন্দ্রনাথ পড়েন তার প্রমাণ আছে। শুধু বিদ্যাপতি নয় সমগ্র পদাবলী সাহিত্য নিয়ে তখন যেন গবেষণায় নেমেছেন কবি এবং উপযুক্ত সহকর্ম্মীও পেয়েছিলেন বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে। তাই "রবিচ্ছায়া"র সঙ্গে—১২৯২ বৈশাখে (১৮৮৫) দেখি "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত—"পদরত্নাবলী" (আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে)। দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার আর ছোট্ট 'নিবেদন'টি প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের লেখা মনে হয় :—

"অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালী যে বৈষ্ণব কবিগণের পরিচয় গ্রহণ করেন না, আমাদের বোধ হয় ইহার একমাত্র কারণ—বৈষ্ণব

---

* গ্রীয়ারসন মিথিলায় যে ৮২টি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে ৭৬টি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—শ্রীপদামৃতমাধুরী। (৪।৪৯ পৃঃ)

কাব্যশাস্ত্রের অতি বিস্তৃতি। বটতলার "পদকল্পতরু" প্রত্যেক সংস্করণে কিছু না কিছু রূপান্তর লাভ করে; প্রথমতঃ আমরা তাহার ৪।৫ খানি সংস্করণের সহিত শ্রীরামপুরের পদকল্পতরু মিলাইয়া লইয়াছি। পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পলতিকা এবং শ্রীগীত-চিন্তামণি হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এ সম্বন্ধে আমাদের প্রধান সহায়—দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার গুরুকুল শ্রীখণ্ডের মোহান্ত মহাশয়দের গৃহে রক্ষিত কীটদষ্ট হাতের লেখা পূরাণ পুঁথির রাশি। বলা বাহুল্য, তথাপি অনেক অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। কতকগুলি ভণিতা মিলে নাই—তুই একটিতে এক-আধটা লাইনের অভাব আছে।।কোন কাব্য-রসজ্ঞ পাঠকের যদি জানা থাকে অথবা কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া যদি সে অভাব পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, তবে ভরসা করি, তাঁহার অনুগ্রহে দ্বিতীয় সংস্করণে এবারকার অসম্পূর্ণতা দূর হইতে পারিবে। বেশী টীকায় রসানুভাবকতার বিঘ্ন করে করে বলিয়া ইচ্ছাক্রমেই সে সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করা হয় নাই।"

পাতা কুড়ি ভূমিকাদি বাদ দিলে বাকী ১০৮ পাতার মধ্যে সম্পাদকদ্বয় বিদ্যাপতির ১১, চণ্ডীদাসের ১৩, গোবিন্দদাসের ১১, জ্ঞানদাসের ৯, বলরামদাসের ১৭, রায় শেখরের ৬, রায় বসন্তের ৬, অনন্তদাসের ৪, মোট ৭৭ এবং আরো পাই ২৯টি অন্য কবিদের পদ, যথা: যতুনন্দন, নরোত্তম, যতুনাথ, উদ্ধবদাস, বংশীদাস, নরসিংহ, বিপ্রদাস, যাদবেন্দ্র, মাধব, প্রেমদাস, বংশীবদন, শ্রীনিবাসদাস, জগন্নাথ, বৃন্দাবন দাস, নরহরি ও লোচনদাস।

কীর্ত্তনের সুরে যেমন বিশেষত্ব দেখা দেয় বাঙ্‌লাদেশে, তার সঙ্গে ভারতের অন্য দেশের—যথা দ্রাবিড় ও দাক্ষিণাত্যের—কীর্ত্তনের মিল নেই। রবীন্দ্রনাথ সুরশিল্পী এবং প্রত্যেক গানে সুরের নাম দিয়েছেন: মাথর সুহই, ভাটিয়ারি, পটমঞ্জরী, করুণ টোড়ি, মঙ্গল, মওয়ারি, গান্ধার প্রভৃতি নিজস্ব "কীর্ত্তন" সুর বাদে অধিকাংশ পদাবলীর রাগ-রাগিণী মার্গ সঙ্গীতের ধারাই অনুসরণ করেছে; যথাঃ রামকেলী, ললিত, বিভাস, টোড়ী, ভৈরবী, আশাবরী, বরাড়ি, ধানশী, সিন্ধু ড়া, সারঙ্গ, শঙ্করাভরণ কামোদ, কল্যাণ, ইমন ভূপালি, গুর্জ্জরী, জয়-জয়ন্তী, গান্ধার, শ্রীরাগ, কানাড়া, বিহাগড়া, মল্লার, কেদার, বেহাগ প্রভৃতি। অবশ্য খোল-করতালের ছন্দে হয়ত এইসব রাগ-রাগিণী ক্রমশঃ কিছু অন্য রূপ নিয়েছে। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এ বিষয়ে তাঁর "শ্রীপদামৃতমাধুরী"তে সবিস্তার আলোচনা করেছেন।

জয়দেবের যুগেও বড় বড় রাগ ও তালে পদাবলী গাওয়া হত, তাঁর সংস্কৃত পদগুলিও সে নিয়মের বাইরে নয়। আবার চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনেও রাগ-রাগিণী সুনির্দ্দিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ তাই বিদ্যাপতির "ভরা বাদর" পদে নিজ প্রেরণায় মল্লার যোজনা করে সেই প্রাচীন ধারারই অনুসরণ করেছেন। তাঁর 'শৈশব সঙ্গীতে'র দোসর 'ভানুসিংহের' পদাবলীতেও যেন মার্গ-সঙ্গীত-ঘেঁষা "কীর্ত্তন" শুনি। তাঁর সব ভাবপ্রধান গানই—রাগপ্রধান ত বটেই সে গান "রবি-কীর্ত্তন" নাম নিতেও পারে। শান্তিদেব ঘোষও আমার মতের সমর্থক দেখে সুখী হলাম (রবীন্দ্র-সঙ্গীত—পৃঃ ৭৭-৭৮)

বাংলা কীর্ত্তনের ঢপ ও আখরাদি তাদের মধ্যে পুরো না দেখা দিলেও রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সুর-বিন্যাস বাংলার নিজস্ব ভাটিয়ারি, কীর্ত্তন ও বাউলের প্রাণশক্তিতে ভরপুর। 'গীতাঞ্জলি' পর্য্যন্ত স্বরলিপিকারদের তিনি কোন বাধা দেননি রাগ-রাগিণী ও তালের নির্দ্দেশ ছাপাতে। তার পর থেকে তিনি এসব নির্দ্দেশ তুলে দিয়েছেন। তবু গাইবামাত্র চেনা যায় তাদের রাগ-কৌলিণ্য, যদিও 'বর্ণসঙ্করের' অভাব নেই। খাঁটি কীর্ত্তনের রীতি ও ঠাট নিয়েও তিনি, পরবর্ত্তী যুগে, ধূর্জ্জটীপ্রসাদের সঙ্গে গরাণহাটী মনোহরসাহী, রেণেটি প্রভৃতির কীর্ত্তন-শৈলীর অনেক আলোচনা করেছেন। কীর্ত্তনশাস্ত্র-প্রবীণ অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ও স্বীকার করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু পদাবলীর নয়, উচ্চাঙ্গ কীর্ত্তনেরও একজন পাকা সমঝদার ছিলেন। ১২৮২ সালে 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করে দেন যে, বিদ্যাপতি বাঙ্গালী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ তখন ১৪ বছরের বালক, কিন্তু পদাবলী পড়তে শুরু করেছেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি যেমন প্রথম সুর দিয়েছেন বিদ্যাপতিতে (১৮৭৬) তেমনি ১২৯৩ (১৮৮৬) পর্য্যন্ত দেখি রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির একটি "সংস্করণ" প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। আমার পিতৃ-বন্ধু—গোবিন্দলাল দত্ত (অক্রূর দত্ত পরিবারের "সাবিত্রী" লাইব্রেরীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) তাঁর ঘোষণাপত্রও ছেপেছেন, যথা : People's Library থেকে ॥০ আনায় সেই ১৫০ পাতার বই ১৫ই অগ্রহায়ণ (১২৯৩) প্রকাশিত হবে ; এবং প্রায় "দশ (১৮৭৬-৮৬)

বৎসরাধিক কাল ধরে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর পাঠাদি করার ফলে সেই সংশোধিত সংস্করণ তিনি প্রস্তুত করেছেন।" কিন্তু হঠাৎ এক দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যভরা কারণে সেই বই আর সাধারণের হাতে আসেনি—এই তথ্যটি বন্ধুবর অমল হোম "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

তার কিছু আগে (১৯৪২)আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ভক্তি-ভাজন পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন বাংলা বইগুলি শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে পরীক্ষা করবার। তিনি প্রথম দেখান গ্রীয়ারসনের বিদ্যাপতি এবং আমি দেখেছি তার পাতায় পাতায় কবির স্বহস্ত-লিখিত মন্তব্যাদি রয়েছে। হরিচরণ পণ্ডিত মহাশয় আর একখানি বই আমাকে দেখান অক্ষয়চন্দ্রের "চণ্ডীদাস-কৃত পদাবলী" (১২৮৫ = ১৮৭৮) যেটি রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রার হয়ত কিছু আগেই বেরিয়েছিল। পাতা উল্টাবার সময় হঠাৎ লক্ষ্য করে চমকে উঠেছিলাম কারণ:

(১) বহু পদে পেনসিলে কবি দাগ দিয়েছেন—যেখানে অর্থে বা পাঠভেদে সন্দেহ তাঁর জেগেছে। হয়ত "পদরত্নাবলী" ভাল করে পরীক্ষা করলে তার হদিশ মিলবে।

(২) এই পাঠভেদ ও অর্থভেদ সমস্যা নিয়েই—মনে পড়ল—রবীন্দ্রনাথের প্রধান অভিযোগ তিনি প্রকাশ করেন ১৮৮১ সালের ভারতীতে।

(৩) ৩০৬ পৃষ্ঠায় এক চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে তুলনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ দীন চণ্ডীদাসের পদ ১৪৫ পাতায়। অন্ততঃ

"তুই চণ্ডীদাসে"র ছায়া "রবিচ্ছায়া"র যুগেই রবীন্দ্রনাথের মনে নেমেছে।

(৪) আমার চরম বিস্ময় যে, ঐ "চণ্ডীদাস" বইখানির এক কোণে দেখি রবীন্দ্রনাথের নিজ হাতে আঁকা নায়ক-চিত্র (২৩৯ পৃঃ)—পেনসিলে আঁকা। তাঁর "পদরত্নাবলী" প্রকাশের আগে (১৮৮৫) যদি এ ছবি তিনি এঁকে থাকেন, তাহলে রবীন্দ্রনাথের চিত্র-শিল্পচর্চ্চা সত্তর বছরে (৭০) নয় (যেমন তাঁর প্রবীণ বয়সের ছবি দেখে আমরা ধরে নিয়েছি!) হয়ত ২০।২৫ বয়সেই স্থুরু হয়েছিল।

বৈষ্ণব ভাবরাজ্যে রবীন্দ্রনাথের অভিসার যেন এক অভিনব কীর্ত্তনের পালা বলেই মনে হয়। সে রাজ্যের রূপ, রস, পদ, ছন্দ ও সুর সবই যেন তিনি নিজের করে নিয়েছিলেন। তাই ১৮৮১ সালের মধ্যে তিনি রচনা করেছিলেন "ভানুসিংহের পদাবলী" এবং 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' শীর্ষক প্রবন্ধ (ভারতী ফাল্গুন ১২৮৮) ও বসন্ত রায় পদকর্ত্তার আলোচনা ১২৮৯ (১৮৮২) ভারতী পত্রিকায়। ক্রমশ দেখি বটতলার ও শ্রীরামপুর সংস্করণ "পদ-কল্পতরু" ও "কীটদষ্ট হাতের লেখা পুরাণ পুঁথির রাশি" প্রভৃতি নিয়ে গভীর গবেষণা এবং ১২৯১ (বৈশাখ) অর্থাৎ ২৪ বছর বয়সে "পদরত্নাবলী" প্রকাশ। ১২৯৩ (অগ্রহায়ণে) যে "বিদ্যা-পতি" তিনি প্রায় প্রকাশ করেছিলেন তাঁর রহস্যজনক অন্তর্দ্ধান বাংলা-সাহিত্যের জটিল সমস্যা থেকে গেল; কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রেরণা চিরন্তন হয়ে রয়ে গেল রবীন্দ্র-সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও শিল্পে।

"রবীন্দ্র-সঙ্গীত" গ্রন্থে শান্তিদেব ঘোষ দুচারটি মূল্যবান মন্তব্য এ বিষয় করেছেন, সেটা উদ্‌ধৃত করি : "জীবনের শেষার্দ্ধে রচিত বহু গান গুরুদেবের হাতে পড়ে যে সম্পূর্ণরূপে রাবীন্দ্রিক কীর্ত্তনে পরিণত হয়েছে, এ কথা বাংলার গায়ক মহলে সকলেই জানেন···

১। নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে ; ২। আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি। ৩। ওহে জীবন বল্লভ। ৪। কে জানিত তুমি ডাকিবে। ৫। আমি সংসারে মন দিয়েছিনু। ৬। তুমি কাছে নেই বলে হের সখা তাই—ইত্যাদি গানগুলি প্রচলিত প্রথামত প্রথম জীবনে লিখিত আখর-যুক্ত কীর্ত্তন।"

কাঁচা রচনা কিছু রবীন্দ্রনাথ বাদ দিয়েছেন তা স্বীকার করে শান্তিদেব লিখছেন : "আখর ইত্যাদি বর্জ্জিত, বাউলের প্রভাব-যুক্ত ও গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের জীবনে যার সূত্রপাত (১৯০০ থেকে) এরূপ কীর্ত্তনাঙ্গের গানকেই আমি প্রকৃত রাবীন্দ্রিক কীর্ত্তন বলি"।

শুধু পুরান কবিতা বা গানই নয় ছেলেবেলার লেখা বইগুলিও কবি "অচলিত" করে দিয়েছিলেন ; হয়ত সেই জন্যই এত নূতন রচনা নব নব প্রেরণায় লিখে যেতে পেরেছেন। কিন্তু "রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী" পাকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে সেই সব "অচলিত"দের এখন চালু করতে হবে। তাই ভানুসিংহকে মেঘমুক্ত করে সবার সামনে ধরতে চেষ্টা করেছি ; ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীতে শেষ এই পদাবলী ছাপা হয় কিছু পরিবর্ত্তন

করে ; তার পর দু'একটি গানের টুকরো ছাড়া কিছু দেখা যায়নি। হঠাৎ 'ভানুসিংহ' নাম বহুকাল পরে লোকের মনে পড়ল পদাবলী নয়, রাণুকে লেখা গদ্য "পত্রাবলী" পড়ে! এক বছর পরে (অর্থাৎ ১৮৮৪—৮৫) "রবিচ্ছায়ায়" কবি (হয়ত তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রনারায়ণের তাগিদে) কেবল গুটিকতক গান উদ্‌ধৃত করেছেন :—

১। শুনলো শুনলো বালিকা—ভৈরবী—একতালা

২। সজনি সজনি রাধিকালো (শঙ্করা স্থানে)
মাজ-একতালা

৩। গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে—ঝিঁঝিট একতালা

৪। আজি সখি মুহু মুহু—মিশ্র বেহাগ—ঝাঁপতাল

৫। মরণ রে —(পূরবী স্থানে) ভৈরবী—কাওয়ালী

"রবিচ্ছায়া"য় সুরের কিছু বদল করেছেন, এবং তালের সঙ্কেত দিয়েছেন। কিন্তু সেই ৪।৫টি গান ছাড়া ভানুসিংহের অন্য গান আজ গাওয়ান বা শেখান কঠিন ব্যাপার, হয়ত শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বেশীর ভাগ জানেন। দীনেন্দ্রনাথ জানতেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যেরাও সব জানেন না। এই অবস্থার কিছু উন্নতি করার চেষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়। ১৩২৪ সালের "গান", যেটি ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ থেকে ছাপা হয়েছিল, তাতে ভানু-পদাবলী ৪।৫টি ছাড়া নেই অথচ ২২।২৩ বছরের রবীন্দ্রনাথের গানের সমজদার যে বেশই ছিল তার প্রমাণ কিছু এবার দেব সেকালের উল্লেখযোগ্য কিছু বিজ্ঞাপন থেকে :—

প্রথম বিজ্ঞাপন সঞ্জীবনী ২০।২৭ বৈশাখ ১২৯২ (২।৯ মে ১৮৮৫)।

"রবিচ্ছায়া"—বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ; সিটি কলেজের শিক্ষক বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত ঃ—রবীন্দ্রবাবু ২৮ বৎসর পার না হইতেই একজন বিখ্যাত কবি ও প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ-লেখক বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছেন···সঙ্গীত প্রণয়নে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে···সঙ্গীতগুলি যেমন সরল, সুমিষ্ট, কবিত্বপূর্ণ, তেমনি মনোহারিণী রাগিণীতে সংবদ্ধ। এমন হৃদয়মুগ্ধকর সঙ্গীত বাঙালীর মধ্যে আর কেহ প্রণয়ন করিতে পারেন কিনা আমরা জানি না। সংগ্রাহক মহাশয় রবিবাবুর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সঙ্গীতগুলি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীর সঙ্গীত-পিপাসা নিবৃত্তির এক বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। রবিচ্ছায়া বাঙ্গালা ভাষায় এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এ সৃষ্টির জন্য রবিবাবু ও যোগেন্দ্রবাবু উভয়কেই ধন্যবাদ দিতেছি।"

২২শে অগ্রহায়ণ ১২৯২ "সঞ্জীবনী"—

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় মুগ্ধ হন নাই এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী বিরল। তিনি কবিতা লিখিয়া বঙ্গ-ভাষায় এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। সেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি "রবিচ্ছায়া" নামে বিক্রিত হইতেছিল···বঙ্গবাসী! যদি কখনও নির্ম্মল পবিত্র আমোদ অনুভব করিবার বাসনা থাকে, যদি কখনও হৃদয় মনকে ক্ষণকালের নিমিত্ত সংসারের অতীত করিতে অভিলাষ হয়, যদি কখনও বিষাদময় অন্ধকার জীবনে জ্যোৎস্না-

লোক আনয়ন করিতে মানস থাকে, তবে আপনার জন্য সুবিধার সময় আসিয়াছে···

মূল্য কমিল—৸০ স্থলে ।৷০

১০ই চৈত্র ১২৯৯ (১৮৯৩) রবীন্দ্রনাথ নিজে 'বাল্মীকি-প্রতিভা ও গানের বহি' প্রকাশকালে লিখছেন—

"শ্রীযুক্তবাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মহাশয় আমার কতগুলি গান নানা খাতাপত্র হইতে উদ্ধার করিয়া রবিচ্ছায়া নাম দিয়া একটি গানের বহি করেন। সেজন্য পাঠকেরা না হউন আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। সেই গ্রন্থ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং ইতিমধ্যে অনেকগুলি গান নূতন রচিত হইয়াছে। এই কারণে নূতন পুরাতন সমস্ত গান লইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম······অবশেষে পাঠকদিগের নিকট নিবেদন এই যে, গ্রন্থের অধিকাংশ গানই পাঠ্য নহে। আশাকরি সুর-সংযোগে শ্রুতিযোগ্য হইতে পারে।"

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

(২)

ভানু-ভগ্নী "রবিচ্ছায়া" প্রায় ১৮৮৩-১৮৯৩ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মনকে অধিকার করেছিল। তবু তিনি যোগেন্দ্র-নারায়ণের পোষ্যপুত্রী! কিন্তু রবিচ্ছায়ার দাদা ভানুসিংহকে ১৮৮৪ সালে পৃথিবীতে এনে কবি তাঁকে প্রায় ত্যাজ্যপুত্র কেন করেছিলেন জানি না! হয়ত দত্তক-পুত্র বলে গ্রহণ করতে সে যুগে অনেকেই রাজী হতেন। একজন ত নিশ্চয় হতেন কিন্তু তিনি অকালে চলে গিয়েছিলেন; তাঁকে স্মরণ করে তাঁর কাছেই আমার অনুযোগ পৌঁছে দেব: ইনি রবীন্দ্রনাথের চিরস্মরণীয়া বৌদিদি-কাদম্বিনী (কাদম্বরী) দেবী; শিশুরবি মা হারা (১৮৭৪) হওয়ার পর থেকে ইনি মায়ের মত স্নেহে কবিকে পালন করে এসেছিলেন। ছোট বৌদি ও বালক-দেবর মিলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণ পড়তেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গৃহিণী ও সাহিত্যের সমজদার বলে কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন ও কাদম্বিনী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করে-ছিলেন। তাঁর "সারদামঙ্গলের" প্রভাব বাল্মীকি-প্রতিভায় আছে, কবি নিজেই স্বীকার করছেন। "কালমৃগয়া" অভিনয়ে

জ্যোতিরিন্দ্র দশরথ ও রবীন্দ্র অন্ধমুণি হয়েছিলেন। হঠাৎ সেই সব আনন্দের দিন যেন পলকে নিভে গেল। ১৮৮৩ ডিসেম্বর মাসে কবির বিবাহ মৃণালিণী দেবীর সঙ্গে। ১৮৮৪ (১২৯১, ২৫ বৈশাখ) কবির ২৩ বর্ষের জন্মোৎসব : ছবি ও গান; নলিনী (নাট্য) ইত্যাদি ছাপা হয়ে গেছে ; ২৯ এপ্রেল বেরল "প্রকৃতির প্রতিশোধ" (নাট্যকাব্য)—নামের মধ্যেই যেন ভীষণ ইঙ্গিত ! ২০শে মে ১৮৮৪ কাদম্বিনী দেবী অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন— সেদিনের কালো ছায়া "জীবন স্মৃতির" শেষ পাতা যেন ভরে আছে। ২৯শে মে প্রকাশিত হল "শৈশব।সঙ্গীত"—কবির ভাষায় ১৩ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের কবিতা। উৎসর্গ করেছেন এমন ভাষায় বৌদিদিকে যে, আজও মনকে নাড়া দেয়—

"এ কবিতাগুলি তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই মনে হইতেছে, তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবে।" ঐ বছরেই ১লা জুলাই (১৮৮৪) প্রকাশিত হ'ল ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।। উৎসর্গ-পত্রের ৩।৪টি ছত্রে কী মর্ম্মস্পর্শী বেদনা—

"ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না।" এই সময়ে হয়ত তাঁকে উদ্দেশ্য করেই লেখা—

একটি কবিতা পরে (১৮৮৬) "কড়ি ও কোমলে" ছাপা হয়েছিল—

"হায় কোথা যাবে ?
অনন্ত অজানা দেশ নিতান্ত যে একা তুমি
পথ কোথা পাবে !"

কবিকে যিনি মাতৃহারা অবস্থায় সস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন ; তাঁর তিরোধানে ভানুসিংহ যেন সত্যি মাতৃহীন হয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য জগতে প্রবেশ করল। তার সম্বন্ধে আমার দরদ হয়ত সেজন্য একটু বেশী হয়েই আজ প্রকাশ পেল। রবীন্দ্র-কাব্যে তার স্থায়ী আসন না থাকলেও রবীন্দ্র সঙ্গীতের ইতিহাসে ভানুসিংহের পদাবলী উপেক্ষণীয় নয়। তার জন্ম-বৎসরেই (১৮৮৪) গীতকার রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ছাপা হয়েছিল "সঙ্গীত মুক্তাবলী"তে—(প্রভাত রবি, পৃ ১৯৪)—

"এই যুবক কবি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন... ইঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, শিক্ষিত বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হয়। ইঁহার সঙ্গীতে অনেক রকম নূতন সুর, নূতন ভাব সম্মিলিত দেখা যায়। ধন্য রবীন্দ্রনাথের লেখনী। রবীন্দ্রনাথ উত্তম সংগীত-রচয়িতা বলিয়াই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ এমত নহে, সুগায়ক বলিয়াও বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।"

'ভানুসিংহ' প্রকাশের (১৮৮৪ জুলাই) আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'সুগায়ক বলিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ' করেছিলেন, তা'র কিছু প্রমাণ দেব।

হিন্দু মেলায় রবীন্দ্রনাথ দু'বার দু'টি কবিতা পড়েছিলেন—(১৮৭৫ ও ১৮৭৭)। রচনা দুটি পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সে খবর পাকা হয়ে গেছে। অর্থাৎ ১৩ বছর থেকে ১৫ বছরের রচনাও কিছু পাওয়া গেল। সেই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন (জ্যোতিরিন্দ্রের সহপাঠী) সেই মেলায় উপস্থিত হয়ে একটি বিবরণ লিখেছিলেন : "স্মরণ হয় ১৮৭৬ খৃঃ আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে "নেশনাল মেলা" দেখিতে গিয়াছিলাম····· দেখিলাম, সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নবযুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯ (আপাতদৃষ্টিতে আসলে—১৩।১৪) শান্ত স্থির। বৃক্ষতলে যেন একটি স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন, ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ···দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোষাক। সহাসিমুখে করমর্দ্দন শেষ হইলে, তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী-লাঞ্ছন কণ্ঠে এবং কবিতার মাধুর্য্যে ও ফুটনোম্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম। তাহার দুই একদিন পরে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার চুঁচুড়ার বাড়ীতে লইয়া গেলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমি "নেশনাল মেলায়" গিয়া একটি অপূর্ব্ব নবযুবকের গীত ও কবিতা শুনিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি একদিন একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও

গায়ক হইবেন। অক্ষয়বাবু বলিলেন: "কে? রবি ঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুর-বাড়ীর কাঁচামিঠা আঁব।" সেই অক্ষয়বাবুই ১৮৮৫তে 'ভাই হাততালি' প্রবন্ধে যুবক রবীন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করলেন; কিন্তু তার প্রায় দশ বছর আগে কবি নবীনচন্দ্র সেন যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি-বলে বালক রবিকে চিনেছিলেন সে তাঁরই গৌরব। পকেট থেকে 'নোটবুক' বার করে (এটি তাঁর চিরকেলে স্বভাব) একটি দুটি নয়, 'কয়েকটি' কবিতা ও গান রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছিলেন। সে কোন্ কোন্ গান ও কবিতা? নিজের হতে পারে দাদাদেরও হতে পারে, কারণ রবি রচিত দুটিমাত্র গান এ পর্য্যন্ত আমরা ধরতে পেরেছি, ১৮৭৫তে প্রকাশিত 'সরোজিনী' নাটকে "জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" এবং 'পুরু বিক্রম' (১৮৭৪) নাটকে ১৩ বছরের বালক রবীন্দ্রনাথের "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" (খাম্বাজ একতালা) তখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে; সুতরাং বালক-কবি হয়ত সে গানগুলি নবীনবাবুকে শুনিয়েছিলেন। কারণ তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের পিতৃবন্ধু রাজনারায়ণ বসু ঐ গানটি কেমন মেতে উঠে গাইতেন সেকথা কবি নিজেই জীবন-স্মৃতিতে লিখে গেছেন। ভুলাকরে এ গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলে আজও অনেকে মনে করেন, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই গানটির স্বরলিপি ছাপার সময় রবীন্দ্রনাথ রচিত লিখেছেন।

সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথই আবার তাঁর জীবন-স্মৃতিতে আর একটি গানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন—উদ্ধৃত করি:

"সঞ্জীবনী সভার" সভ্যগণের মধ্যে জাতিবর্ণ নির্বিচারে আহারেরও একটি বিধি ছিল···কোন এক ব্রাহ্মণ জমিদার-সভ্যের গঙ্গার ধারে একটি বাগানবাড়ীতে একবার আমাদের একটি প্রীতি-ভোজ হয়···খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে খুব এক ঝড় উঠিল! রাজনারায়ণবাবু সেই সময় গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়াঃ 'আজি উন্মদ পবনে'—বলিয়া রবীন্দ্রনাথের নবরচিত একটি গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।" আসলে গানের আস্থায়ী বা আরম্ভটা বাদ দিয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে বলে খুঁজে পেতে দেরি হয়—যা হোক গানটির সুরুতে পাই—

"সজনি গো—
শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা।"—ইত্যাদি

এটি প্রথম 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' যেটি আশ্বিন ১২৮৪ অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭তে ভারতীতে ছাপা হয়েছিল। সুতরাং 'নব-রচিত' বটেই এবং সুরও রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রাগিণী মল্লার—যে সুর তিনি চন্দননগরেই বিদ্যাপতির পদে বসিয়েছেন—১৬ বছর বয়সের গায়ক—সেকথা যথাস্থানে লিখেছি। সুতরাং

"উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত
ঘন ঘন গর্জিত মেহ
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠত
থর থর কম্পত দেহ।"

এই পদে ও সুরবিন্যাসে গায়ক রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ রাজ-

নারায়ণকেও মাতিয়ে তুলেছিলেন সে আর আশ্চর্য্য কি ? এই প্রীতিভোজের গীতসভার ঠিক এক বছর পরে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ সালে—রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রা, কিন্তু তার আগে ভানুসিংহ ছাড়া আরো কিছু গান—যথা : 'বলি ও আমার গোলাপ-বালা' ইত্যাদি, আমেদাবাদে রচনা করেন। ১৮৮০ (এপ্রিল) বিলাত থেকে ফিরেই জ্যোতিরিন্দ্রের 'মানময়ী' গীতি-নাটিকায় সদ্যরচিত গান রবীন্দ্র জুড়ে দিলেন "আয় তবে সহচরী"। শুরু হল বিরাট গীতোৎসবের প্রস্তুতি :—যার অক্ষয় পরিচয় রয়েছে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১) ও 'কাল মৃগয়া'র (১৮৮২) রচনা ও প্রযোজনায়।

ইতিমধ্যে দেখি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় কলকাতা ছেড়ে বৈদ্যনাথে বসেছেন ও তার জীবনের শেষ কুড়ি বছর (১৮৭৯-১৮৯৯) সেখানেই কাটে। সেখানে যাওয়া করে গেছেন বিলাত-ফেরত রবীন্দ্রনাথ ও ট্রেনে বিসর্জন নাটকের প্রারম্ভিক গল্প 'রাজর্ষি' তাঁর মনে জাগে।

১৮৮২ (১২৮৮, ১৫ই শ্রাবণ) রাজনারায়ণের চতুর্থ কন্যা লীলাদেবীর সঙ্গে ভবিষ্যৎ "সঞ্জীবনী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ। তার নিখুঁৎ বিবরণ সৌভাগ্যক্রমে লীলা দেবী লিপিবদ্ধ করে গেছেন, এবং তাঁর পুত্র বন্ধুবর সুকুমার মিত্রের সৌজন্যে আমি পড়বার সুযোগ পেয়েছি। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে সেই প্রথম জমকাল বিবাহ-সভা—আচার্য্য হয়েছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং; এবং নগেন্দ্রনাথ

চট্টোপাধ্যায় (রামমোহন জীবনচরিত রচয়িতা) ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, কেদারনাথ মিত্র, অন্ধ চুণীলাল ও নরেন্দ্র দত্ত (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) মহাশয়গণ সঙ্গীত করিয়াছিলেন···শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়—

'তুই হৃদয়ের নদী' (সাহানা-ঝাপতাল) ; 'জগতের পুরোহিত তুমি' (খাম্বাজ একতালা) 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে' (বেহাগ-তেতালা)—প্রভৃতি সঙ্গীত রচনা করিয়া গায়কদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

লীলা দেবীর ডায়েরী থেকে এই অমূল্য তথ্য পেলাম যে, শুধু কবি নন, গায়ক-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবরচিত গান ১৮৮১ সালে সঙ্গত করে শেখাচ্ছেন পাকা কীর্ত্তনীয়া সুন্দরীমোহন দাসকে শুধু নয়, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণ-মাতান শিষ্য নরেন্দ্র দত্তকেও—যিনি সেকালের একজন নামজাদা কলাবিৎ—যাঁর গান শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছুটে আসতেন দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায়! অভেদানন্দজীর পাখোয়াজের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত গাইতেন সেকথা শুনেছি। কিন্তু রাজনারায়ণ-নন্দিনী লীলা দেবীর খাতায় প্রথম পড়লাম যে, রবীন্দ্রনাথের 'তুই হৃদয়ের নদী' প্রভৃতি গান ভবিষ্যৎ স্বামী বিবেকানন্দও মহড়া দিয়ে শিখেছিলেন। নরেন্দ্র দত্ত তখন ব্রাহ্ম-সমাজের সদস্য ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহকর্মী। এমনি কত অমূল্য তথ্য এত অল্পদিনেই আমরা ভুলেছি বা হারিয়েছি। সেকালের প্রত্যেক গান তাঁদের সুর তাল ও পদ সমেত তন্নতন্ন করে পরীক্ষা

করা উচিত—তবেই অনেক "লুপ্তরত্নোদ্ধার" হওয়ার সম্ভাবনা।

এইখানেই "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর" বিশেষত্ব যে তার পদকর্ত্তা সুরকার ও গায়ক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বাংলার সুরলোকে এক বিশিষ্ট স্থান কুড়ি বছর বয়সেই অধিকার করেন—এটি মনে রেখে ভানুসিংহের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নূতন সংস্করণ সঠিক স্বরলিপি সমেত প্রকাশ করা উচিত।

রবিচ্ছায়া

[রবির বয়স তখন কত? চব্বিশ-পঁচিশ! তখনও হয়ত বৌঠান কটাক্ষ হানছেন কবির লেখা সম্বন্ধে—ঠিক বিহারীলালের মত হচ্ছে না লেখা। কিন্তু কবি-কণ্ঠের গান শুনে বৌঠান্ বাক্যব্যয় করতে পারেন নি, এমন কি তাঁর ছেলেবেলায়। সেই স্বরশিল্পীর প্রথম সঙ্গীতগ্রন্থ "রবিচ্ছায়া" প্রথম প্রকাশের কাহিনী বড় কৌতূহলোদ্দীপক। এই লেখায় "রবিচ্ছায়া" সম্বন্ধে সবিশেষ আলোকপাত রয়েছে।]

রবিঠাকুর কবি হবেন কি না, কোনও কালে বিহারী চক্রবর্ত্তীর মতো লিখতে পারবেন কি না—এ নিয়ে তাঁর বৌঠাকুরাণীর সাথে যখন তর্ক চলত তখন কিন্তু রবি গাইয়ে হবেন একথা কেউ অবিশ্বাস করেননি। ছন্দ-সরস্বতীর পূজার প্রথম ফুলগুলি বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে, শুধু একটি কবিতার গদ্যরূপ কবি নিজেই রেখে গেছেন তাঁর "ছেলেবেলা"তে ঃ "মনে পড়ে পয়ারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম, তাতে এই দুঃখ জানিয়েছিলুম যে সাঁতার দিয়ে পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের হাতের ঢেউ-এ পদ্মটা সরে সরে যায়, তাকে ধরা যায় না…"।

কবির বয়স হয়ত তখন বছর দশেক অর্থাৎ ১৮৭০-৭১ ; তার আগেই তাঁর পিতৃদেব মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথের শিশুকণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনে বাঙলার "বুলবুল" বলে তাঁকে আদর করতেন ; পিতৃবন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহ নেচে উঠতেন শিশু রবির গান শুনে "ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাঁশরী"। নাম-ভাঁড়ান সুরকার ভানুসিংহের পদাবলী তখনই যেন সুরু হয়ে গেছে। হারমোনিয়মের কলটেপা সুরের গোলামি করতে হয়নি, কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যাস করেছেন কত নাম-হারা গাইয়ের কাছে, বিখ্যাত ধ্রুপদী বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ও সুররসিক যদু ভট্ট প্রভৃতির কাছে শিক্ষা চলেছে, তার উপর রবীন্দ্রনাথের দাদারা তানসেন, সদারঙ্গ প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলি আমন্ত্রণ করেছেন বাঙলা ভাষায়।

কিন্তু তান-কর্ত্তবের রাজ্য ছেড়ে সুরশিল্পী রবীন্দ্রনাথ যেদিন বাল্মীকির মতই আপন প্রাণের আবেগে প্রথম গেয়ে উঠেছিলেন, তার সন তারিখ স্পষ্ট জানা নেই। শুধু তেমনি একটি তারিখ-হারান বর্ষার আলাপ তিনি রেখে গেছেন 'ছেলেবেলায়' (৭০ পাতা), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দননগরের গঙ্গা-তীরে—

"নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে, মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ওপারে বনের মাথায়। অনেকবার এই রকম দিনে নিজে গান তৈরি করেছি—সেদিন তা হলো না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল

আমার মনেঃ 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'। নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে, রাগিণীর ছাপ মেরে, তাকে নিজের করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে-করা বাদল-দিন আজো রয়ে গেছে আমার বর্ষা-গানের সিন্ধুকটাতে···বৌঠাকরুণ ফিরে এলেন, গান শোনালুম তাঁকে, ভালো লাগল বলেননি—চুপ করে শুনলেন : তখন আমার বয়স হবে ষোল কি সতেরো।"

অর্থাৎ ১৮৭৭-৭৮ সালের কথা। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' প্রথম পর্য্যায় শেষ হয়ে গেছে, 'ভারতী' পুরো দমে চলছে। 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকায় ১২ বছরের বালক রবীন্দ্রনাথের কাঁচা লেখা "অভিলাষ" ও "নদী" কবিতা ছাড়া অনেক কাঁচা-পাকা লেখা তাঁর 'ভারতী' 'জ্ঞানাঙ্কুর' ইত্যাদি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। কিছু তার 'শৈশব সঙ্গীত' ও "অচলিত" সংগ্রহে স্থানও পেয়েছে। ১৮৭৫ সালে জ্যোতিরিন্দ্রের সরোজিনী নাটকে 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'—এবং সঞ্জীবনী সভার জন্য 'এক সূত্রে বাঁধা আছি সহস্রটি মন' ও 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ' গানগুলিও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন জানি। কিন্তু তাঁর অচলিত-গান নিয়ে আলোচনা প্রায় সুরু হয়নি বললেই চলে! শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁর রবীন্দ্র-সঙ্গীত গ্রন্থে অনেক কিছু সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় সংস্করণেও উল্লেখ নেই একটি গীতি-সংগ্রহের যার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য কম নয়। এর নাম "রবিচ্ছায়া"; নামকরণ করে-

ছিলেন সুরকার রবীন্দ্রনাথ নিজেই, তার প্রমাণ চিঠিতেই আছে ; অথচ 'রবিচ্ছায়া' আজও কাব্যে উপেক্ষিতা হয়ে আছে কেন ?

তাঁর গানের ইতিহাসটা চাপা পড়ে গেল কারণ ১৮৭৮-৮০ অর্থাৎ দু'বছর রবীন্দ্রনাথ বিলাতে কাটালেন। বিলাত যাত্রার ঠিক মুখে অর্থাৎ ১৮৭৮ (এপ্রেল-সেপ্টেম্বর) আমেদাবাদে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের বাসায় আরো গান লিখে স্বাধীনভাবে সুর দিয়েছেন যথা, 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়' ('রবিচ্ছায়া'র প্রথম গান : মিশ্র আড়াঠেকা), 'বলি ও আমার গোলাপবালা', 'শুন নলিনী খোলো গো আঁখি', 'আঁধার শাখা উজল করি' ইত্যাদি।

১৮৮০ সালের শেষে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরেই 'সঙ্গীত ও ভাব' প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' নাটকে দেখা দেন ও শেষ গানটি রচনা করেছিলেন : 'আয় তবে সহচরী।' তারো আগে তাঁদের বাড়ীতে "বিবাহোৎসব", "বসন্তোৎসব" (স্বর্ণকুমারী দেবীর) প্রভৃতি গীতি-নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আরো গান কিছু দিয়েছেন কি না তার প্রমাণ দেওয়া শক্ত, কারণ পালাগুলিই লুপ্ত হয়েছে। তবু কিছু তার অমূল্য সংকেত রয়ে গেছে 'রবিচ্ছায়া'র মধ্যে।

কিন্তু এ বইখানি বহুকাল ছাপা হয়নি সুতরাং দুষ্প্রাপ্য। ১৮৮১তে "বাল্মীকি-প্রতিভা" ও ১৮৮২তে "কাল-মৃগয়া" রচনা ও অভিনয়াদি হয়েছে। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একসঙ্গে গানও

করেছেন অভিনয়ও করেছেন; সাক্ষ্য দেবার মানুষ আজ শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী ছাড়া কেউ বেঁচে না থাকলেও কবির নিজের মুখে শুনেছি যে তাঁর গীতিনাট্যে কি বিরাট সাড়া পড়েছিল। আর সব চেয়ে বড় সাক্ষী হয়ে আছেন অমর বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি 'বাল্মীকি-প্রতিভা' স্বচক্ষে দেখে 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর আনন্দের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়ে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে।

১৮৮৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর বিবাহ। প্রায় এক বছর পরে—১০শে ডিসেম্বর ১৮৮৪—অধুনা বিস্মৃত-প্রায় অথচ আদিম রবিভক্ত শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র ১ নং বেনেটোলা লেন থেকে চিঠি লিখছেন:—"রবিবাবু!... ছায়া-আলোক ভাল শুনায় না...ছায়া মানে হৃদয়ের প্রতিবিম্ব বুঝাইতে পারে, তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের ছায়া না বুঝাইতেও পারে, ঐ এক কথার মধ্যে আলোক আঁধার দুই থাকিতে পারে। যে নামটি ভাল বোধ হয় এই লোকের নিকট অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিবেন..."।

সেই চিঠিরই কোণে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন:—

"আলোছায়া বল্লে কেমন হয়? আর 'রবিচ্ছায়া' যদি বলেন সে আপনাদের অনুগ্রহ। নামকরণের ভার আপনার উপরে—যখন আপনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন তখন তার গোত্র ও নাম আপনারই দাতব্য, আমার সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক নেই।"

সুর-লোকের প্রথম কবি-নন্দিনী "রবিচ্ছায়ার" জন্মকথা ও নামকরণ যে চিঠিখানিতে আছে সেটি দেখবার সৌভাগ্য হল ৺যোগেন্দ্রনারায়ণের উপযুক্ত পুত্র বন্ধুবর অমল মিত্রের সৌজন্যে। তিনি বহু যত্নে সেকালের দলিল-পত্র রক্ষা করেছেন ও কবিভক্তদের দেখবার সুযোগ দেন বলেই 'বারোদুয়ারী' রবীন্দ্র-সঙ্গীত মহলের একটা চাপাপড়া দরজা একটু খুলতে চেষ্টা করছি। প্রথমেই দুষ্প্রাপ্য "রবিচ্ছায়া" থেকে রচয়িতার নিবেদন এবং প্রকাশকের বক্তব্যটি পাঠকদের উপহার দিতে চাই ঃ—

'রবিচ্ছায়া' রচয়িতার নিবেদন

বর্ত্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত অধিকাংশ গান সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না।

ইহার অনেক গানই বিস্মৃত বাল্যকালের মুহূর্ত্ত-স্থায়ী সুখদুঃখের সহিত দুইদণ্ড খেলা করিয়া কে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল—সেই সকল শুষ্কপত্র চারিদিক হইতে জড় করিয়া বইয়ের পাতার মধ্যে তাহাদিগকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিলে গ্রন্থকার ছাড়া আর কাহারও তাহাতে কোন আনন্দ নাই।

আমার এইরূপ মনের ভাব। এইজন্য এ গানগুলি আজ সাত-আট বৎসর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, আমি ছাপাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি নিজে হইলে হয়ত ছাপাইতাম না। কিন্তু প্রকাশক মহাশয় যখন ছাপাইতেছেন, তখন আর আমার তাহাতে আপত্তি কিছু নাই। আমার পক্ষে

সে ত সুখেরই বিষয়। এখন প্রকাশক মহাশয়ের সঙ্গে পাঠকদের বোঝাপড়া।

অনেক কারণে গান ছাপান নিষ্ফল বোধ হয়। সুর সঙ্গে না থাকিলে গানের কথাগুলি নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তাছাড়া গানের কবিতা সকল সময়ে পাঠ্য হয় না, কারণ সুরে ও কথায় মিলিয়া তবে গানের কবিতা পঠিত হয়। এইজন্য সুর ছাড়া গান, ছাপার অক্ষরে পড়িতে, অনেক স্থলে অত্যন্ত খাপছাড়া ঠেকে। বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার বিস্তর উদাহরণ আছে, পাঠক মহাশয়ের গোচরার্থে নিবেদন করিলাম ইতি।

পুনশ্চ—অনেকগুলি গানে রাগ-রাগিণীর নাম লেখা নাই। সে গানগুলিতে এখনও সুর বসানো হয় নাই। সঙ্গীতজ্ঞ পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে সে অভাব পূরণ করিয়া লইতে পারেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলি গান আমার দাদা—পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুরের অনুসারে লিখিত হয়। অনেকগুলি গানে আমি নিজে সুর বসাইয়াছি। এবং কতকগুলি গান হিন্দুস্থানী গানের সুরের সঙ্গে বসানো হয়।

ভানুসিংহের সমস্ত গান এই গ্রন্থে নিবিষ্ট হইল না। সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল তাহা হইতে গুটিকয়েক গান উদ্ধৃত হইল।

স্বাঃ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশকের বক্তব্য

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। প্রতি বর্ষেই তাঁহার অনেকগুলি করিয়া নূতন সঙ্গীত বাহির হইতেছে। বিধাতা তাঁহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন, অবকাশ দিয়াছেন, তিনি বিধাতার দানের সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন। বাঙালী পাঠকমাত্রেই তাঁহার কবিতার সহিত সুপরিচিত। নূতন করিয়া আমার কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখি না। তাঁহার কবিতাগুলি সরল, সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী, তাঁহার সঙ্গীতগুলি ততোধিক সরল, সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী। তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি তান লয় স্বরযোগে যখন গীত হয়, তখন মনে হয় বুঝি স্বর্গ হইতে সে সকল সঙ্গীত আকাশ ভাসাইয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীতলে এ সংসার-দাব-দাহে দগ্ধ মানবমণ্ডলীকে শান্তি দিবার জন্যই নামিয়া আসিতেছে। এ ঘোর সংসার-কাননে 'তমস-ঘন-ঘোর-গহন-রজনী'র নাম শুনিয়া কোন্ পান্থ-হৃদয় না ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত হয়? বা সেই 'জীবনের ধ্রুবতারা'র উদ্দেশ্য পাইয়াই বা কোন্ অনুতপ্ত হৃদয় না আশ্বাস লাভ করে? বাস্তবিক সে সঙ্গীত শ্রবণে প্রাণ ইহলোকের অতীত হইয়া যায়, পাঠ করিলে অসাড় প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগিয়া ওঠে, ঘোর সংসার-মুগ্ধ প্রাণও ক্ষণকালের জন্য উদাস ভাব ধারণ করে। তাঁহার স্বভাব-সঙ্গীত প্রকৃতিকে নবভাবে সাজাইয়া হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত করে। প্রকৃতি যেন কোমল জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়া দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চক্ষের সম্মুখে আগমন করে। তাঁহার

প্রণয়-সঙ্গীতগুলি সুমধুরভাবে হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে, প্রাণে বিশুদ্ধ প্রেমের সঞ্চার করে।

এই সঙ্গীতগুলি এতদিন রচয়িতার উদাসীনতা বশতঃ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কখনও আলোক দেখিত কিনা জানি না। সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি যে সকল বিদ্যার গুণে মানবহৃদয়ের কোমল ভাবগুলি সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয়, সেগুলির আদর আমাদের দেশে ক্রমেই বাড়িতেছে ইহা অতি আনন্দের বিষয়। কিন্তু তবুও গুরুজনের নিকট গান করিতে অনেকেই সংকোচ বোধ করেন, তাহার কারণ সচরাচর দুইটি,—সামাজিক শিক্ষার অভাব,—আর ভাল গানের অভাব: শেষোক্ত কারণটি কতক পরিমাণে দূরীকরণ করা এই পুস্তকের একটি উদ্দেশ্য। সাধারণে এই সঙ্গীতগুলি গান করিয়া ও পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন, তাই সযতনে তাহা সংগৃহীত করিয়া এই "রবিচ্ছায়া" প্রকাশ করিলাম: ১২৯১ সনের শেষ দিন পর্যান্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে দেওয়া হইল।

সিটি কলেজ, বৈশাখ ১২৯২

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র

যোগেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের এক বয়সী (১৮৬১ সালে জন্ম)। কবি যখন বিলাত থেকে ফিরে (১৮৮০) নব প্রেরণায় বাল্মীকি-প্রতিভা, কাল-মৃগয়া প্রভৃতি গীতিনাট্য

রচনা-প্রযোজনায় ও ভানুসিংহ (১৮৮৪) প্রকাশে মেতে আছেন, তখন যোগেন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়া ছাড়তে বাধ্য হয়ে সিটি কলেজে চাকরী নিয়েছেন। খাঁটি আদর্শবাদী এই যুবকটিকে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্ম-নেতারা স্নেহ করতেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকতা (১৮৮৪) গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন উচ্চাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করছেন, তেমনই অন্যদিকে জাতীয় মহাসভার জন্ম-বৎসরে (১৮৮৫) শুভ শঙ্খ-ধ্বনি করছেন রবিচ্ছায়ার জাতীয় সঙ্গীতে। "এ কি অন্ধকার এ ভারত ভূমি"—গানটিতে জুড়েছিলেন 'প্রভাতী' রাগিণী—আমাদের নব জীবন-প্রভাতের যেন সূচনায়। খাঁটি সমঝদার যোগেন্দ্রনারায়ণ ভাগ্যবান সাথীরূপে রবীন্দ্রনাথের কত গানই শুনেছেন আর মনে মনে গেঁথে তুলেছেন মেঘরাগ-নন্দিতা "রবিচ্ছায়া" :—

ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা। জলদে
গাও রে শতে অশনি মহা নিনাদে,
ভীষণ প্রলয় সংগীতে
জাগাও জাগাও জাগাও রে—এ ভারতে।

তার পাশেই 'জয়-জয়ন্তী' রাগিণীতে কবির রচনা—

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান ॥

এই গানটি কবির ১৭ বছরে বিলাত যাত্রার পূর্ব্বেই 'ভারতী'তে ছাপা হয় এবং রবিচ্ছায়ার "জাতীয় সংগীত" অংশে গৌরবের আসন পেয়েছে। কলকাতার দ্বিতীয় কংগ্রেস (১৮৮৬) অধিবেশনে 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি রামপ্রসাদী সুরে কবি নিজে গেয়ে শুনিয়েছিলেন: যেমন ১৩০৩ সালের কংগ্রেসে (১৮৯৬) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে-মাতরম্' গানটি দেশ রাগিণীতে গেয়ে কবি সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠও যে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, সেকালের লোকেরা তাঁর গান শুনে স্বীকার করে গেছেন।

কবির জাতীয় সংগীতের রীতি, সুর ও সংখ্যা বেড়ে চলেছে রবিচ্ছায়ার যুগ থেকে। তার মধ্যে আরো পাই ৭৬টি "ব্রহ্ম-সংগীত" যার মধ্যে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের যুগ, তথা নিধুবাবু, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ও যদু ভট্টের সুর-প্রবাহের ছন্দ-বৈচিত্র্য ও গভীর পরিচয় রবীন্দ্রনাথই আমাদের দিয়ে গেছেন। রামমোহনের যুগ থেকে সুরু করে ১২৮৯ (১৮৮১) পর্য্যন্ত ওস্তাদ বিষ্ণু আদিব্রাহ্ম সমাজের গায়ক হিসাবে কত ভজন ও সাধন-সংগীত রচনা করেছেন, শিখিয়েছেন ও শুনিয়ে শান্তি দিয়েছেন—তারও কিছু পরিচয় রবীন্দ্র-রচনার মধ্যে পাই। উচ্চাংগের মার্গ সংগীত যে রবীন্দ্র-সংগীতের ভিত্তি, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ কবির ব্রহ্ম-সংগীতের পর্ব্বে পর্ব্বে আছে।

তৃতীয় বিভাগে দেখি রবিচ্ছায়ার প্রকাশক ১১৬টি গান সন্নিবেশিত করেছেন:—এগুলিকে পরে "বিবিধ সঙ্গীত" বলা

হয়েছে (১৯০৯—১৯১৬ মধ্যে)। প্রায় প্রত্যেক গানের মাথায় রাগ ও তালের নির্দ্দেশ সেকালে কবি নিজেই দিয়েছেন। হয়ত ঘটনাচক্রে এই বর্গের প্রথম গান: "নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়"—"মিশ্র" রাগিণীর পতাকা সগৌরবে ধরে আছে! পূর্ব্ব ও পশ্চিম রবীন্দ্রনাথের রচনায় শুধু মিশেছে নয় সার্থক সমন্বয় পেয়েছে। Robert Browning এর Abt Vogler এর মত তিনি তাঁর শাশ্বত সুর-সৌধ গড়ে তুলেছেন কত বিচিত্র উপাদানে, সেটি বুঝতে হলে রবিচ্ছায়ার (১৮৮৪-৮৫) প্রথম সুর-সঞ্চয়ন থেকেই আমাদের পাঠ নিতে হবে। তার কিছু আগে তিনি প্রকাশ করেছেন 'ভানুসিংহ' পদাবলী—"শৈশব সঙ্গীতে"র জুড়িদার। তাঁর কাব্য-সন্তানদের নামকরণেও দেখি বীণাপাণির ঝঙ্কার: 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' (১৮৮১) 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩) ইত্যাদির সঙ্গে তাল রেখে 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) 'মায়ার খেলা' (গীতিনাট্য, ১৮৮৮)।

রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনায় নেমে বহু লেখক তাঁর ভাব, ভাষা, প্রভাবাদির আলোচনা করেছেন, কিন্তু সুর ও তালকানা হয়ে যে রবীন্দ্র-রচনার মর্ম্মস্থলে পৌঁছন যায় না, আজও অনেকের সেদিকে হুঁশ নেই। এই হুঁশ হয়ত ফিরে আসবে যদি "রবিচ্ছায়া" প্রভৃতি গানের বই-এর পাশাপাশি রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা যায়। বিশ্বভারতীর সঙ্গীত-ভবন, গীত-বিতান ও দক্ষিণী প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে এ ক্ষেত্রে

সহযোগিতা পাবার চেষ্টা করা উচিত; তবেই রবীন্দ্র পাঠ-চক্রগুলি জীবন্ত ও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

'রবিচ্ছায়া'র রচয়িতা হিসাবে ২২ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ সহজ বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, অনেকগুলি গান তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরে বাঁধা, আবার অনেকগুলিতে তিনি নিজেই সুর বসিয়েছেন। যে সব গানে রাগ-রাগিণীর নাম লেখা নেই সেগুলিতে সুরের অভাব পূরণ করে নেবার অধিকার তিনি দিয়েছেন সঙ্গীতজ্ঞদের হাতে। এই অধিকার দানের তাৎপর্য্য কবির জীবদ্দশায় হয়ত স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু ভাবীকালে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের উত্তরোত্তর বিকাশ যখন এ দেশে হবে তখন হয়ত বোঝা যাবে। 'জনগণমন' প্রভৃতি গান নিয়ে আলাপ-প্রলাপে হয়ত তার পূর্ব্বাভায আমরা পেয়েছি। রবীন্দ্র সুর-ভারতীর ও Tagore Auditorium গড়ে তোলার দায়িত্ব ও অধিকার দেশবাসীকে অনেক বার স্মরণ করিয়েছি; কিন্তু হাততালি কিছু পেলেও সাধারণের কাছ থেকে আসল সাড়া আজও পাইনি। হয়ত অপেক্ষা করতে হবে, হয়ত পাশ্চাত্য সুর-রসিকদের তাগিদে ও সাহচর্যে আমাদের স্বপ্ন এক দিন সত্য রূপ পাবে।

ভবিষ্যতের আলোচনা স্থগিত রেখে এ প্রবন্ধে শুধু স্মরণ করাতে চাই যে, রবিচ্ছায়ায় ছাপা আদিম গানগুলি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের আলাপের খুব সার্থকতা আছে এবং আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান বাকি আছে ৺যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের

উদ্দেশ্যে, যিনি কবির শৈশব সঙ্গীতের যুগ থেকে স্বদেশী যুগ পর্য্যন্ত কত বিচিত্র সুরের ঐক্যতান শুনেছেন ও আমাদের শোনাতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসরের বিরাট সম্বর্দ্ধনা দেখে ও কবির প্রীতি-আলিঙ্গন লাভ করে কল্যাণমিত্র যোগেন্দ্রনারায়ণ পরলোক গমন করেন (১৪ জানুয়ারী ১৯৩১)। তাঁর ছবি হয়ত বাঙ্গালী দেখেনি। এ যুগের আর দু'জন কবি-বন্ধুর নামও আজ স্মরণ করাতে চাই—বহু ভাষাবিৎ কবি প্রিয়নাথ সেন ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। বাড়ীর লোক না হয়েও তাঁরা কত বড় অন্তরঙ্গ ছিলেন সেটা কবিগুরুর মুখে শুনেছি। কিন্তু একজন সাহিত্য-রসিকের নামটা তাঁর কাছ থেকে যাচাই করে নিতে পারিনি, শুধু তাঁর গদ্য নক্‌সার (Pen-picture) একটু নিদর্শন এখানে উদ্‌ধৃত করে এ আলোচনা শেষ করব। বঙ্গদর্শন প্রায় দশ বছর প্রচার করে দ্বিতীয় বার বন্ধ হয়ে গেল ১২৮৯ সালে (ইং ১৮৮২) তখন বঙ্কিচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রচার' পত্রিকা প্রকাশ করলেন (শ্রাবণ ১২৯১) এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার ছাপতে সুরু করলেন 'নবজীবন' যার মধ্যে বঙ্কিম দিয়েছেন তাঁর ধর্ম্মতত্ত্ব প্রবন্ধ ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর (হয়ত প্রথম) ছোট গল্পের খসড়া 'রাজপথের কথা' (১৮৮৪)। তার মধ্যে একটি বেনামী লেখা 'হুতোম পাঁচার গান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; কারণ রাধাকান্তদেব-বাড়ী ও বিদ্যাসাগর থেকে সুরু করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর পর্য্যন্ত কেউ বাদ

যাননি লেখকের ব্যঙ্গ-বর্ষণ থেকে। তেমনি আর একটি সার্থক বেনামী রচনা: "ভাই হাততালি"। কেশব সেন থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত কত নেতাদের আমরা মাথা ঘুরিয়েছি, হাততালি দিয়ে—সেটা বর্ণনা করে লেখক ২৩ বছরের তরুণ নেতা রবীন্দ্রনাথের নিখুঁৎ ছবিখানি এঁকেছেন: "সেই অমল কোমল কমলশোভা-সমন্বিত মুখশ্রী, সেই উজ্জ্বল ভাসা-ভাসা ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত পদ্মপলাশলোচন, সেই ঝামর-চামর-নিন্দিত, গুচ্ছ গুচ্ছ স্বভাববেণী-বিনায়িত চিকুর-ঝলঝল মুখমণ্ডল, সেই রহস্যে আনন্দে মাখান হাসিখুসি ভরা অধরপ্রান্ত, সেই সৎচিন্তার প্রসর ক্ষেত্র সুন্দর শুভ্র পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট—ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। না, এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল—ভরসার সম্বল..."।

এ ভাষা ও পদবিন্যাস কার? * হয়ত সঠিক ভাবে আমরা জানব না; কিন্তু এটি যে গভীর ভবিষ্যদ্বাণী, সে বিষয়ে আজ কারো সন্দেহ নেই।

* পণ্ডিত-সাংবাদিক বন্ধু অমল হোম আমায় জানান যে উক্ত রচনাটি অক্ষয় সরকারের হওয়া সম্ভব।

স্বদেশী গানে রবীন্দ্রনাথ

১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ ও তৎপ্রসূত 'স্বদেশী আন্দোলন' শুধু বাঙ্গালীদের কাছে নয়, সারা ভারতের মানুষদের কাছে এক চিরন্তন প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি-সাহিত্যিক নন তিনি একাধারে রাষ্ট্রনৈতিক নেতা, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক মন্ত্রগুরু; তাঁর "স্বদেশী-সমাজ" অপূর্ব্ব মণীষা ও মৌলিকতায় ভরা ও বঙ্গ-ভঙ্গের আগেই ১৯০৪ সালে প্রকাশিত। সে প্রবন্ধটি আজও তন্ন তন্ন করে আমাদের পড়া উচিৎ, কারণ মহাত্মা গান্ধীর শেষ পঞ্চায়েৎ-তন্ত্রের পূর্ব্বাভাষ তার মধ্যে পাই; যেমন, অহিংস প্রতিরোধ বা Passive Resistance দক্ষিণ আফ্রিকায় জয়যুক্ত হবার আগেই ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক (বৈশাখ ১৩১৬)—অত্যাচারী রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে ধনঞ্জয় বৈরাগীর দলের সত্যাগ্রহ। গণ-দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় রবীন্দ্রনাথের এই যুগেই। অগণ্য জনপ্রবাহ তাঁকে মাথায় করে গর্জ্জে উঠেছে, এগিয়ে চলেছে—এটি তাঁর মুখে শোনা গল্প নয়, আমাদের চোখে-দেখা ঘটনা। জন-সাধারণের কণ্ঠে কণ্ঠে তখন তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্র-সঙ্গীত।

তারও বিশ বছর আগে "রবিচ্ছায়া"য় ছাপা। অল্প কয়েকটি স্বদেশী গান ১৯০৫-৬ সালে যেন জাতীয় সঙ্গীতে বন্যা ডাকিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়সী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় থেকে অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতি তরুণ সুর-শিল্পীদের অর্ঘ্যেও ডালি ভরে উঠেছিল সে যুগে, যখন অরবিন্দ ও তাঁর দলের বিচারের মধ্যে বন্দীরা গেয়ে উঠতো দেশমাতৃকার বন্দনা-গান; উল্লাসকর দণ্ডিত হয়েই আদালতের মধ্যে গেয়ে উঠেছিল—

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।"

রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত কত ফাঁসীর আসামীদের প্রাণেও প্রেরণা জুগিয়েছিল সেকথা গবেষণা করে আমাদের জানতে হয়নি। বাংলার বুকে যেন হোমের আগুন জ্বলে উঠেছিল পঞ্চাশ বছর আগে, যেমন আজও জ্বলছে, অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আর এক অঙ্গচ্ছেদের ফলে।

১৯০০ সালে দেখি রবীন্দ্রনাথ 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' শেষ করে নূতন ছন্দে আত্মপ্রকাশ করছেন 'কথা ও কাহিনী'তে, 'নৈবেদ্য'র আত্মোৎসর্গে (১৯০১) এবং নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে ও প্রবাসীতে তাঁর অতুলনীয় গদ্য রচনায়ঃ আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ চারিত্রপূজা, লোকসাহিত্য, কণ্ঠরোধ, রাজা-প্রজা, সমূহ স্বদেশ, শিক্ষা (জাতীয় শিক্ষা পরিষদ), তপোবন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা—প্রভৃতি কত অমূল্য রচনা, সর্ব্বোপরি স্বদেশী যুগের গদ্য মহাকাব্য 'গোরা'

(১৩১৪-১৬)—যেটি মাসের পর মাস প্রবাসী থেকে কাড়াকাড়ি করে আমরা পড়েছি।

বিংশ শতকের প্রথম দশকে যেন এক নূতন রবীন্দ্রনাথ নূতন বাণী নিয়েই আবির্ভূত হলেন। অথচ 'অনাদি অতীতের' সঙ্গেও তাঁর গভীর যোগ আছে সেটি এবার বোঝাতে চেষ্টা করব, কয়েক দশক পিছু হেঁটে গিয়ে। সেখানে কোথাও দেখা পাব তাঁর অনেক ভুলে-যাওয়া সহকর্মীদের, তাঁর মণীষী দাদাদের, এমন কি তাঁর পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অন্তরঙ্গদের। অনেক রকম আলোড়ন ও পরিবর্ত্তন স্বীকার করেও দেখব এক বিরাট অপরিবর্ত্তনীয় অবদান বাংলার ও বাঙালী জাতির—যার ফল ভোগ করছে আজ সারা ভারত—হয়ত সারা এসিয়া।

তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটকাদির ধারা ছেড়ে স্বদেশী ভাবধারাটিকে অনুসরণ করে যাবো 'জাতীয় সঙ্গীত' পর্য্যায়ের গানগুলিকেই প্রধান অবলম্বন করে। রবি-বাউলের আবির্ভাব আমাদের স্বদেশী গানের তথা রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিবর্ত্তনে কম রহস্য-ভরা ইতিহাস নয়।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম বিচিত্রকীর্ত্তি "ঠাকুর পরিবারে" ; রবীন্দ্র-প্রতিভার স্ফুরণে ও গঠনে সেই পরিবারটির অবদান নিয়ে অনেক দিন ধরে অনেক কিছু লেখা হয়েছে ; হয়ত একটু বেশী করেই লেখা হয়েছে বলে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁর জীবনী-লেখককে অনুযোগ করেছিলেন যে, সেটা যেন তাঁর জীবনীর চেয়ে 'প্রীন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের জীবনী'ই বেশী মনে হয় (অন্ততঃ

প্রথমদিকে !) ; হয়ত কবি রবীন্দ্রনাথ সাবধান করাতে চেয়েছিলেন শুধু কুলপঞ্জী আলোড়নের বিপক্ষে ! তাঁর স্বরচিত 'ছেলেবেলা' ও 'জীবনস্মৃতি' আমাদের কাছে অমূল্য উপাদান ; অথচ অন্য মালমশলা সংগ্রহের কাজেও নামতে হবে—কারণ অনেক তার নষ্ট হয়ে গেছে ও শীঘ্র যাবে : নূতন চোখ নিয়ে কাজে নামতে না পারলে নূতন উপাদান মেলাও কঠিন ব্যাপার।

তাঁর জন্ম, শৈশব ও কৈশোর কাল কেটেছে দেশের এক বিষম যুগ-সঙ্কটে (১৮৫৮-১৮৭৮) ; প্রথম জাতীয় যুদ্ধ (Mutiny শেষ হয়েছে রক্ত-বন্যায় ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে উঠিয়ে বৃটিশ জাতি তার পার্লামেণ্ট ও সাম্রাজ্ঞী ঘোষণা মারফতে (Queen's Proclamation) নূতন শাসন সুরু করেছে। এতবড় বিপ্লব কেন ও কি ভাবে হয়ে পড়ল, তা বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের পিতা ও পিতামহের যুগ পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করতে হয় : কারণ নূতন বাংলায় স্বাধীনতার আন্দোলন মানব-স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ রামমোহন রায়ের চিন্তা ও কর্মধারার সঙ্গেও যুক্ত। প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ উত্তর পশ্চিমে নয়, ব্যারাকপুরে (১৮২৪)—সেটা ভোলা চলে না। যাহোক ১৮৫৩ থেকেই তুমুল তর্ক চলছিল যে, ভারত থেকে কোম্পানীর রাজ্য ওঠা উচিৎ কি না। সেই সময়েই আবার দেখি অনেকের সঙ্গে Karl Marx ব্রিটিশ শোষণ-নীতির কঠোর সমালোচনা সুরু করে দিয়েছেন। এদিকে ১৮৫১ (সেপ্টেম্বর) দেশহিতার্থী সভা (*The National Association*) স্থাপিত হল ;

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম সম্পাদক ও তাঁকে সাহায্য করতে এলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি এবং Kirkpatric নামে স্কচ্ সাহেব। এখানেও রবীন্দ্র-পিতামহ দ্বারকানাথের নীতির অনুসরণ; অর্থাৎ ইংরাজকে হটাতে হলে ইংরেজ-সহকর্মী নিতে হবে, যেমন George Thompsonকে বিলাত থেকে এনে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি কর্মীদের দ্বারকানাথ গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৫৪ জানুয়ারী পর্য্যন্ত অর্থাৎ দু'বছরের উপর সম্পাদকের কাজ করে দেবেন্দ্রনাথ পদত্যাগ করেন ও রাজা প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ দেশহিতার্থী সভার সম্পাদক হন। তার আগেই দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজে (এবং হয়ত অন্যত্র) National Associationএর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি এই সভার সঙ্গে British Indian Associationএর কাজের সংযোগ রেখে চলেছিলেন। এই সভা থেকে পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন সম্পর্কে এক স্মারকলিপি (Memorial) পাঠান হয়, যার লিপিকার ছিলেন হয়ত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পরে Hindoo Patriotএর স্বনামধন্য সম্পাদক)। হরিশচন্দ্র ও সম্বাদ-প্রভাকর প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য ও দেবেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহকর্মী ছিলেন। ১৮৫৯ খৃঃ দেখি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনকে নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। রামমোহন ও দ্বারকানাথের মত দেবেন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন যে সর্ব্বজনীন ধর্মের ভিত্তিতে মিলিত হলে ভারতবাসীদের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সুগম

হবে এবং ঐক্য-মন্ত্রেই স্বাধীনতার সাধনা ভারতে জয়যুক্ত হবে। তাই দেবেন্দ্রনাথ সে যুগে স্পষ্ট লিখেছিলেন:—"যদি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে। তার পূর্ব্বেকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে..." ("দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী"); এই মহান উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি Indian Mirror (আগষ্ট ১৮৬১) ও পরে National Paper প্রতিষ্ঠিত করেন।

২রা অক্টোবর ১৮৫৬—১৫ই নভেম্বর ১৮৫৮ অর্থাৎ দু'বছর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ের নানা স্থানে ধ্যান-ধারণায় কাটিয়েছিলেন। সে যুগে তাঁর ব্রহ্মসাধনার সঙ্গে স্বাধীনতার সাধনাও মিলেছিল বলেই তাঁর পরিবারে—বিশেষ তাঁর গুণী পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬), সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৩) ও কন্যা স্বর্ণকুমারী (১৮৫৫-১৯৩১) প্রভৃতির প্রাণে ও রচনায় সেই উদার স্বাদেশিকতার গভীর পরিচয় পাই। এঁদের রচিত বহু গানে দেখি অধ্যাত্ম অনুভূতির সঙ্গে মিশে আছে স্বাধীনতার প্রবল আবেগ এবং দুইএর চরম সমন্বয় ও পরাকাষ্ঠা মিলবে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম-সঙ্গীতে ও স্বদেশী গানে।

মিউটিনির বছরেই দেখি "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" গানের রচয়িতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১২৩৪-৯৪)

"পদ্মিনী" প্রকাশিত হ'ল। Col. Todd-এর রাজপুত কাহিনী থেকে এক নূতন ভাবস্রোত বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করতে সুরু হ'ল! রঙ্গলালের 'কর্ম্মদেবী' ও মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক থেকে জ্যোতিরিন্দ্রের 'সরোজিনী' ও তাতে রবীন্দ্রনাথের 'জ্বল জ্বল চিতা' গানটি সেকালের লোকদের মনে কী উদ্দীপনা এনেছিল আমরা হয়ত আজ বুঝতে পারব না। সংগ্রাম করে রক্তদানে স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হবে—এ শিক্ষা যেন শিশু রবীন্দ্রনাথ সহজ আবহাওয়া থেকেই পেয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যুগ ও তার প্রবন্ধগুলি নিয়ে আরো মৌলিক আলোচনা দরকার; রায়ৎ-প্রজাদের শুধু স্বাধীনতা কাড়া নয়—তাদের চাষের জমি ও পেটের ভাত পর্য্যন্ত লুট করার ফলে দেশের অবস্থা কী শোচনীয় হয়েছিল তার বর্ণনা তত্ত্ববোধিনীর লেখাতে প্রথম পাই—ও পরে সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের বঙ্গদর্শনে 'বাংলা দেশের কৃষক' প্রবন্ধে ছাপেন। ইতিমধ্যে (১৯০৮) দীনবন্ধুর নীলদর্পণ ও মধুসূদনকৃত তার ইংরেজী অনুবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে Rev. Long-সাহেবের জেল! এই সব বৈপ্লবিক ঘটনা বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যকে সৌখীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে বিশ্বের দরবারে পাকা আসন দিতে চলেছে রবীন্দ্রনাথের শৈশবে। ১৮৭৫-৭৭ সালের তাঁর প্রথম স্বাক্ষরিত দুটি কবিতাই 'হিন্দুমেলার উপহার' ও Lytton দরবার-কাব্য হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' (১৮৭০) প্রভাবান্বিত। হেমেন্দ্র-নাথ, রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের উৎসাহে এই হিন্দু-

মেলা (১৮৬৭) সে যুগের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। *

সেকালের দীপ্ত বর্ণনা সৌভাগ্যক্রমে লিপিবদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রের সহপাঠী কবিবর নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯); ইনি এডুকেশন গেজেটে (১৮৬৬-৬৮) স্বদেশী কবিতা লিখতে সুরু করেন: "হেমবাবুর ভারত-সঙ্গীত আমার (নবীন সেন) স্বদেশ-প্রেমব্যঞ্জক বহু কবিতা প্রকাশের পর প্রকাশিত হয়।" তাঁর পলাশির যুদ্ধ (১৮৭৭) তরুণদের মনে খুব নাড়া দিয়েছিল। নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' দু'একটি নিখুঁত ছবি এঁকে গেছেন কিশোর রবীন্দ্রনাথের—"১৫ বছরের বালক কিন্তু দেখতে যেন ১৮।১৯—বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে ··তিনি পকেট হইতে একটি নোটবুক বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি কবিতা গীত-কণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী-লাঞ্ছন কণ্ঠে এবং কবিতার মাধুর্য্যে ও স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম···অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে বলিলাম যে, আমি নেসানাল মেলায় গিয়া একটি অপূর্ব্ব নবযুবকের গীত ও কবিতা শুনিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে

* । "দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে" আর তারপরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মত শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার

যে, তিনি একদিন একজন প্রতিভা সম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন।" আবার ১৮৯৩ সালে রাণাঘাটে দেখা : "কুষ্টিয়া যাইবার পথে একদিন প্রাতে নিমন্ত্রিত হইয়া ১০ টার ট্রেনে দয়া করিয়া রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন · সেই (১৮৭৬) নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব! উজ্জ্বল গৌববর্ণ; ফুটনোন্মুখ পদ্ম-কোরকের মত দীর্ঘ মুখ। মস্তকে মধ্যভাগ-বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশশোভা, অলকা শ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণদর্পণোজ্জ্বল ললাট। ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও খর্ব্ব শ্মশ্রু শোভান্বিত মুখমণ্ডল। কৃষ্ণ পক্ষ্মযুক্ত দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল চক্ষু, সুন্দর নাসিকায় মার্জ্জিত সুবর্ণের চশমা ··মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খৃষ্টের মুখ মনে পড়ে। পরিধানে সাদা ধুতি, সাদা রেশমী পিরাণ ও রেশমী চাদর, চরণে কোমল পাদুকা ·আমি তাঁহাকে

গান ছিল মেজদাদার লেখা 'জয় ভারতের জয়," গণদাদার লেখা "লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে," বড়দার "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।" জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন একটি পোড়ো বাড়িতে—তার অধিবেশন, ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত, সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলেন।

এই সকল আকাঙ্খা উৎসাহ উদ্যোগ-এর কিছুই ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে

অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিলাম। আমার তখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের কবিতাটি মনে পড়িল, "দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল"।

নবীনচন্দ্র আরও লিখ্ছেন :

"আমরা তখন তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করিয়া হারমনি-ফ্লুট তাঁর সামনে দিলাম—তিনি একটি পর্দা কিছুক্ষণ টিপিয়া সুরটি মাত্র স্থির করিয়া যন্ত্র ছাড়িলেন ; তাহার পর একটি নূতন কীর্ত্তন গান গাহিতে লাগিলেন :—

'এস এস ফিরে এস !
বঁধু হে ফিরে এস
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত
নাথ হে ! ফিরে এস'

আমার মনে হইতে লাগিল…বংশীবিনিন্দিত মধুর কণ্ঠ এইবার গৃহ পূর্ণ করিয়া ছাদ ভিন্ন করিয়া আকাশ মুখরিত করিতেছে। আবার যেন শিশুর কোমল অস্ফুট কণ্ঠের মত কর্ণে কোমল মধুর স্পর্শের মত অনুভূত হইতেছে। কি মধুর মুখভঙ্গী। গানের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেন মুখ ও চক্ষু অভিনয় করিতেছে। গানের করুণ ভক্তিরস যেন তাঁহার অধর হইতে গোমুখী-নিঃসৃত জাহ্নবীর পবিত্র ধারার মত প্রবাহিত হইতেছে। আমি তখন

প্রবেশ করেছিল। রাজসরকারের কোতোয়াল, হয় তখন সতর্ক ছিল না, নয় উদাসীন ছিল, তারা সভার সভ্যদের মাথার খুলি ভঙ্গ বা রসভঙ্গ করতে আসে নি।"—রবীন্দ্রনাথ।

রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। গীত শুনিতে [illegible] আমি আত্মহারা হইলাম। আমার কঠোর হৃদয়ও গলিল। [illegible] পর তাঁহারা কয়েকটি কবিতার আবৃত্তি করিলেন। রবিবাবু একা-ধারে কবি ও অভিনেতা; তাঁহার আবৃত্তির তুলনা নাই......।"

১৮৭২ সালে যে রবীন্দ্রনাথ দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক' লুকিয়ে পড়ছেন এবং বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন ও অক্ষয় সরকারের 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' নিয়ে মেতে আছেন তিনি ১৮৭৬ ও ১৮৯৩ সালে কবিবর নবীন সেনের চোখে কেমন প্রতিভাত হয়েছিলেন তার আভাষ পাওয়া গেল। 'সোনার তরী'র কবি তাঁর কায়েমি আসন পেয়েছেন সেটি দেখে গেছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র (মৃত্যু ১৮৯৪)—যিনি ১৮৮০-৮১ সালেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র কবি-রবীন্দ্রনাথের অমরত্বের। রবীন্দ্রনাথের গান অনেকেই শুনেছেন সেকালে; কিন্তু নবীন সেনের মতন দরদী ভাষায় প্রকাশ করে যেতে পারেননি তাঁদের অনুভূতি।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতের বিকাশধারা এবার অনুসরণ করা যাক। তার সব চেয়ে কাঁচা কাব্য রচনা ১৩-১৮ বছর বয়সের কবিতা—যাকে তিনি নিজে নাম দিয়েছেন "শৈশব সঙ্গীত"। সে সময়ে খাঁটি জাতীয় গান হয়ত কিছু লিখেছিলেন—রক্ষা পেয়েছে মাত্র দুটি; (১) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরু বিক্রম' নাটকের মধ্যে—খাম্বাজ—একতালা—(দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত ১৮৭৪-৭৯)

"একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন"

তোমারি তরে এ আঁখি ঝরিবে
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।"

এই গান গেয়ে কিশোর-কবি রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন। এ গানের ভাবে ও সুরে আমরা তাঁর দাদাদের স্বদেশী-গানের অনুসরণ যেন স্পষ্ট শুনি। মধুসূদন, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ও মাইকেল জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্র-ভবনে সমাদৃত অতিথি হয়ে বহুদিন দেখা দিয়েছিলেন; তার কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে আমরা পাই।[১]

১৮৬৭ সালে হিন্দু-মেলা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখি কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রসিদ্ধ স্বদেশী গান রচনা করেছেন:

"মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি
দিবা রাত্রি ঝরিছে লোচন-বারি"

এ গান হিন্দু-মেলায় যেমন গাওয়া হত তেমনি মাইকেলের মেঘনাদ—যখন নাট্যরূপ পেল—তার অভিনয়ের আগে 'মলিন মুখচন্দ্রমা' কখনও নট-বেহাগ কখনও তিলক-কামোদ সুরে গাওয়া হয়েছে। ১৮৬৮ হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে দেখি

বাজিতে থাকুক"। (বঙ্গদর্শন—চৈত্র, ১২৭৯)।

সেই বঙ্কিমচন্দ্রই ক্রমশ বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের মাতৃবন্দনা রচনা করে শেষে 'বন্দেমাতরম' ও 'আনন্দমঠের' ঋষি বঙ্কিমরূপে সারা জাতিকে এক নূতন দীক্ষা দিয়েছিলেন ; তার আগে কবি নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র এডুকেশন গেজেটে স্বদেশী গান ছাপতেন, যার মধ্যে ১৮৭০ সালের সর্ব্বজন-বিদিত "ভারত সঙ্গীত" (শ্রাবণ ১২৭৭)—গানে না হোক আবৃত্তিতে—শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন ৯।১০ বছরের বালক মাত্র, তবু তাঁর কাব্য-গীতির আদি পর্ব্বে এই ভারত-সঙ্গীতের প্রভাব সুস্পষ্ট—বিশেষ তাঁর হিন্দু-মেলার কবিতায়। আরো কত ভুলে যাওয়া স্বদেশী গান যে রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তা'র নিদর্শন পাই হিন্দু-

মেলা সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-৬৯) রচিত গানের মধ্যে (বাহার-খং)

"লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে
লুটিতেছে পরে এই রত্নের আকরে
আমরা সকলে হেথা হেলা করি নিজ মাতা
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে ॥

১৮৭৫-৭৬ সালের রাজনৈতিক ইতিহাস জাতীয়-কংগ্রেসের জন্মের ঠিক দশ বছর আগের কথা। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম পর্ব্ব শেষ হয়েছে ও 'ভারতী'র আবির্ভাবের প্রস্তুতি-পর্ব্ব। ঠিক এই সময়ে অতি ক্ষুদ্র আকারে একখানি বই ছাপা হয়েছিল যেটি অনেকের কাছে অজানা—অথচ সেটি যেন সে যুগের জাতীয় ভাবের প্রতীক : (হুবহু নকল করে দিলাম)—

"জাতীয় সঙ্গীত"—(প্রথম ভাগ) স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীতমালা। মূল্য ৵০ আনা (উল্টো পাতায়) National Song Book Part 1 Printed by G. P. Ray & C.o 21 Bowbazar Street (1876). etc ; লেখক বা সম্পাদকের নাম না-ছাপা যে ইচ্ছাকৃত তা' স্পষ্ট বোঝা যায় ; "বিজ্ঞাপন"টি উদ্ধৃত করি :—

এই "জাতীয়-সঙ্গীত" প্রচারের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা যাইবে।······অনেকে এই সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা সংগ্রাহকের (?) কৃতজ্ঞতার পাত্র। যদি এই গ্রন্থদ্বারা অন্তত এক ব্যক্তিরও স্বদেশানুরাগ উদ্দীপ্ত হয় সংগ্রাহক কৃতার্থ হইবেন এবং সামাজিক ও বিশুদ্ধ প্রণয়-ঘটিত সঙ্গীত সকল সংগ্রহ

করিয়া "জাতীয়-সঙ্গীতের" অপর ভাগ প্রকাশ করিবেন। এই গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা কিছু লাভ হইলে তাহা কোন প্রকার জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত ব্যয় হইবে। কলিকাতা ৬ই ফাল্গুন ১২৮২"।

১৮৭৬ সালের "জাতীয় সঙ্গীত" বইখানিতে দেখছি অনেক পুরাতন সমস্যা ও ভাবের সমাবেশ, নীলকরদের অত্যাচার : নীল বানরে সোনার বাংলা ও 'হে নিরদয় নীলকর' গান ছুটি নীল-দর্পণ নাটক থেকে স্থান পেয়েছে। তার সঙ্গে 'মলিন মুখ চন্দ্রমা', 'মিলে সবে ভারত সন্তান', 'লজ্জায় ভারত যশ', ইত্যাদি রবীন্দ্র-নাথের দাদাদের গান; হেমচন্দ্রের 'বাজরে শিঙ্গা' (হয়ত শুধু আবৃত্তি নয়, গাওয়া হত) 'প্রাণ কাঁদে বলিতে ভারতের বিবরণ' প্রভৃতি হিন্দু মেলায় গীত ৭টি গান, (সুর তাল নির্দ্দেশ সমেত); গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কতকাল পরে' ও নির্মল সলিলে বহিছ সদা' গান ছুটি। তাছাড়া দেখি দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলির 'না জাগিলে সব ভারত ললনা' ও অপ্রকাশিত পর্য্যায়ে চারটি গান :

'আছ সপ্ত শত বর্ষ নিদ্রাগত
এখনও জাগো জাগো মা ভারত' ইত্যাদি।

'নীলদর্পণ' নাটক ছাড়া আরো কিছু নাটকের ভিতর দিয়ে স্বদেশীভাব প্রচারিত হয়, তারও প্রমাণ পেলাম 'ভারত মাতা', 'ভারতে যবন', 'বীর-নারী', 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' ইত্যাদি নাটকের ভিতরকার গানগুলির উদ্ধৃতি থেকে। সব চেয়ে বিস্ময় লাগল আমার—যখন দেখলাম জ্যোতিরিন্দ্র-রচিত 'সরোজিনী' নাটিকায়

বালক রবীন্দ্রনাথের সংযোজিত গানের কয়েকটা কলি এই 'জাতীয় সঙ্গীত' পুস্তিকায় (রাগিনী অহং একতালা) তার উপর টীপ্পনী যথা 'ইংরাজী সুরে গান করিতে হয়' :—

জাগ্ রে জগত মেলিয়ে নয়ন
জাগ্ রে চন্দ্রমা জাগরে গগন
স্বর্গ হতে সব জাগ দেবগণ
জলদ অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন তোরাও দেখ্ রে
সতীত্ব রতন করিতে রক্ষণ
রাজপুত সতী আজিকে কেমন
সঁপিছে পরাণ অনল শিখে॥

এই অংশটি দিয়ে গান সুরু করে সম্পাদক অস্থায়ীতে ফিরেছেন :—

'জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা' ইত্যাদি

৩০শে নভেম্বর ১৮৭৫ তারিখে 'সরোজিনী' প্রকাশিত হয় এবং তার মধ্যে ১৪ বছর বয়সের রবীন্দ্র-রচনা এই গানটি ১৮৭৬ সালের 'জাতীয় সঙ্গীতে' সগৌরবে স্থান পেয়েছিল—এটি স্মরণীয় ঘটনা সন্দেহ নেই। তারও প্রায় দুবছর আগে পুরু বিক্রম (১৮৭৪) নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৩ বছরের বালক কবি রবীন্দ্রনাথের গান 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি' গানটি জুড়ে দিয়েছিলেন।

১৮৮৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের * সাহচর্য্যে রবিচ্ছায়া নামক প্রথম গীত-সঞ্চয়িতা প্রকাশ করেন; তখন দেখি ৭।৮টি মাত্র গান জাতীয় সঙ্গীত বলে ছাপা হয়েছিল; তা'র মধ্যে একটি গান আজও শোনা যায়—(রাগিনী প্রভাতী একতালা)

"একি অন্ধকার এ ভারত ভূমি
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।"

কংগ্রেসের জন্ম-বৎসরে এ গানের সার্থকতা আছে। এরপর রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি স্বদেশী গান লেখেন, তার বেশীর ভাগই আমরা ভুলেছি বলে অপরাধ মনে হয়। তার মধ্যে তাল ও রাগের নির্দ্দেশ দিয়ে বেরিয়েছিল; (১) দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাহিয়ে (বাহার কাওয়ালি), (২) কেন চেয়ে আছ গো মা (কাফি), (৩) আমায় বোলোনা গাহিতে বোলোনা (সিন্ধু), (৪) আনন্দধ্বনি জাগাও (হাম্বির ফেরতা)।

১২৯১ (১৮৮৪) সালে ব্রহ্মোপাসনার জন্য কবি (তখন তিনি আদিব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক) লেখেন 'শোন শোন আমাদের ব্যথা' (মিশ্র দেশ-খাম্বাজ ঝাপতাল) এবং 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' (ঝিঝিট)। দ্বিতীয় গানটি ১২৯২ (১৮৮৫)

---

* ইনি সঞ্জীবনী পত্রিকায় (২৭শে বৈশাখ—১২৯২) 'আমরা কেন অস্ত্র পাইব না' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

স্বাদে রচনা করেন, জাতীয় সঙ্গীত বলেও গাওয়া হ'ত ; যেমন 'জন-গণ-মন' জাতীয় সঙ্গীতও ব্রহ্ম-সঙ্গীত বলে ১৯১১ মাঘোৎসবে গাইতে শুনেছি। ১২৯৩ (১৮৮৬) সালে দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় ; তার প্রথম সাড়া পাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহস্রাধিক টাকা কংগ্রেস ফণ্ডে দান— তা'ছাড়া রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন অধুনা সুপরিজ্ঞাত কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত (১) আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে (২) আগে চল আগে চল ভাই (বেহাগ) ; (৩) তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ (ছাত্র সম্মেলনে কবি গেয়েছিলেন) ১২৯৫ (১৮৮৭)। 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' কবি নিজে (রামপ্রসাদী সুরে) গেয়ে কংগ্রেস মহাসভাকে ও সাধারণ শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলেছিলেন ; এ গান আবার ১৯০৫ সালে আমাদের প্রাণে কত বড় প্রেরণা জাগিয়েছিল তা স্বদেশী যুগের লোকেরা সবাই জানেন। ১২৯২-৯৩ সালে/(১৮৮৪-৮৬) আবার দেখি রবীন্দ্র নাথ মন দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গানে ; সেটি নিয়ে আমি "পূর্ণিমা" পত্রিকায় আলোচনাকরেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে মল্লার কাঁওয়ালীতে গানটি নাকি গাইতেন বা গাওয়াতেন : রবীন্দ্রনাথ সুর বদলে দেশ রাগে বন্দেমাতরম (প্রথমাংশ যেটুকু এখনও কংগ্রেসে গাওয়া হয়) গেয়ে বঙ্কিম-চন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন (১৮৯৪ সালে, তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে অবশ্য) ; তাঁর নিজের দেওয়া সুরেই রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম' শোনান কবি নবীন সেনকে ১৮৯৩ সালে, তিনি "আমার জীবনে" নিজেই সাক্ষ্য

দিয়ে গেছেন। ১৮৯১ সনে দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের পত্রিকা "সাধনা"; ১৮৯৩ সনে রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ পড়েন বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া দেশ-রাগেই বন্দেমাতরমের প্রচার সারা ভারতে হয়েছিল এবং ১৩০৩ (১৮৯৬) সালে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা কংগ্রেসে একক কণ্ঠে মুসলমান সভাপতি রহমতুল্লার সামনে "বন্দেমাতরম" শুনিয়ে সেই বিপুল জনতাকে মাতিয়েছিলেন। সেই দিনেই তাঁর গন্ধর্ব্ব-লাঞ্ছিত কণ্ঠস্বরের উপর অত্যধিক চাপে খুব ক্ষতি হয়েছিল, সে কথা কবির মুখে শুনেছি। সেই ১৩০৩ (১৮৯৬) সালেই কবি চিত্রা ও চৈতালী পর্য্যন্ত সব রচনা দিয়ে 'গ্রন্থাবলী' প্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৭৪ সনে প্রকাশিত দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রমে প্রথম স্বদেশী গান "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" ছাপা হয় এবং ২২ বছর পরে ১৮৯৬ (১৩০৩) সালে তাঁর নিজের স্বদেশী গানের সঙ্গে বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' কংগ্রেসে গাইছেন—এ রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে আজ বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। ১৮৯৮ সনে কবি লিখেছেন "কণ্ঠ রোধ" ও সঙ্গে সঙ্গে "তর্জ্জন"।

১৯০০-০১ সনে দেখি পূর্ব্ববঙ্গে তাঁদের জমিদারী পরিদর্শনের কাজ থেকে সরে কার্জ্জনী-যুগে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম-চর্য্যাশ্রম গড়ে তুলতে লেগেছেন। 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' শেষ করে নামছেন 'কথা ও কাহিনী' এবং 'নৈবেদ্য' রচনায়; ও সেই সঙ্গে নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা। ১৯০১ সনে 'নৈবেদ্য' প্রকাশ ও কল-কাতা কংগ্রেসে গান্ধিজীর প্রথম আবির্ভাব। ১৯০২ (অগ্রহায়ণ)

পত্নী-বিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথ যেন ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত মূর্ত্তি। তাঁর সঙ্গে এসে মিলেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—যিনি তাঁর "Sophia" পত্রিকায় সেকালের রবীন্দ্রনাথকে "বিশ্বকবি" বলে অভিনন্দিত করেছিলেন ও পরে 'অগ্নিযুগে'র সন্ধ্যা-পত্রিকা সম্পাদন করে অমরত্ব লাভ করে গেছেন। কার্জ্জনের "বঙ্গভঙ্গ" চক্রান্ত (১৩১২) ও রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব নেতৃত্ব সব আজ সুস্পষ্ট ইতিহাস। তার মধ্যে দেখি ১৯০৩।৪ সনে কবিবন্ধু মোহিতচন্দ্র সেন নয় ভাগে তাঁর "কাব্যগ্রন্থ" ছাপালেন এবং সেই সময়কার বহু গদ্য রচনা হিতবাদীর উপহাররূপে প্রকাশিত হল (১৯০৪)। 'সঙ্কল্প', 'স্বদেশ' ও 'গান' সে যুগে হাতে-হাতে ঘরে-ঘরে স্বাদেশিকতা প্রচার করেছে। সেপ্টেম্বর, ১৯০৫-এ দেখি রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশ' কবিতা ও 'বাউল' (গান) প্রকাশ করে সারা দেশকে এমন মাতিয়েছেন যে প্রবীণ অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বললেন : 'এবার মরা গাঙে বান এসেছে' গানটি শুনিয়া তরী ভাসাইব কি, গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে'। ১৯০৪ সনে রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে কবি তাঁর "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধ পাঠ করেন—সে যেন স্বদেশীযুগের "বোধন"। ১৯০৫ (১৩১২) সালের মধ্যে বহু অমূল্য জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন, যা সমগ্র জাতি চিরদিন সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করবে। ১৯০৫ সনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৮৮ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন এবং ঐক্য মন্ত্রের সেই একনিষ্ঠ সাধক পিতাকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ "কোন আলোতে প্রাণের

প্রদীপ জ্বালিয়ে" গানটি যে রচনা করেন সে গান মৃত্যুবরণকারী অনেক দেশসেবকদের প্রাণে প্রেরণা জুগিয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের (৬ মাঘ ১৯০৯) বার্ষিক স্মৃতি-সভায় ঐ গান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শুনেছি ও দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উপাসনার পর ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাইছেন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে অর্গ্যান বাজাচ্ছেন, প্রথম দেখে মনে হয়েছিল কোন যুগের মানুষ এঁরা, কত বড় জাতীয় ইতিহাসের স্তম্ভরূপে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন। ১৯০৬ সনের কলিকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে বাংলার বুক থেকে উঠল প্রথম জীবন্ত বাণী—"স্বরাজ" আমাদের জন্মগত অধিকার। শিবাজী উৎসবের কবির পাশে তখন দাঁড়িয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীঅরবিন্দ।* সঙ্কট থেকে সঙ্কটে নিয়ে যাওয়ার নেতৃত্ব সেকালে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন—তাঁ'থেকেই সমগ্র জাতি পেয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে (১৯০৮) ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভিতরে, তখনো অজানা, গান্ধিজীর 'অহিংস' প্রতিরোধের পূর্ব্বাভাষ। ১৯০৯-১০ প্রবাসী পত্রিকায়

---

* জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে "জাতীয় বিদ্যালয়" ভাষণটি কবি পাঠ করেন এবং সাহিত্য সম্বন্ধে চারটি বক্তৃতা দেন। ১৯০৬-জাতীয় মহাসভায় প্রবন্ধগুলি তাঁর 'সাহিত্য সম্মেলন' মণ্ডপে পাঠ করেন ও সমগ্র জাতিকে মনে করিয়ে দেন: "এই মিলনোৎসবের বন্দেমাতরম্ মহামন্ত্রটি বাংলা সাহিত্যেরই দান।"

কবি ছেপেছেন "গীতাঞ্জলি" ও "রাজা" এবং লিখে গেছেন স্বদেশী-যুগের গদ্য-মহাকাব্য "গোরা"। ১৯১১ (ডিসেম্বর) কংগ্রেসে তাঁর "জন-গণ-মন" প্রথম গাওয়া হয়। ১৯১১-১২ তার রূপক-নাট্য ডাকঘর ও অচলায়তনের সঙ্গে ৫০ বর্ষ পূর্ত্তির চরম নিদর্শন "জীবন স্মৃতি!"

১৩০৩ থেকে ১৩১২-১৩ (অর্থাৎ ১৮৯৬-১৯০৬) সালের মধ্যে স্বদেশী গান রচনায় রবীন্দ্রনাথ যেন যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন; এই তথ্যটি একটু স্পষ্ট করে যাব, দু'চারটি গানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাফি রাগে তিনি গেয়েছেন; 'কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে' এ গানের অন্তরায় দেখি:

"তুমি দিতেছ মা যা আছে তোমারি
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবীর বারি
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী—"

১৩১০ সালের মধ্যে—অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের আগেই—দেখি উক্ত পদের অপূর্ব্ব রূপান্তর ভৈরবীতে: "ওই ভুবন-মনমোহিনী" ও তার সঙ্গে 'জননীর দ্বারে আজি ঐ', 'নব বৎসরে করিলাম পণ', 'হে ভারত আজি নবীন বর্ষে' প্রভৃতি ২৫।৩০টি জাতীয় সঙ্গীত।

কলাবিৎ রবীন্দ্রনাথ জন্মভূমির 'ভুবনমোহিনী' রূপ যেমন দেখেছেন, তেমনি সুরের ঐশ্বর্য্যও সেকালে দেখিয়েছেন। হঠাৎ ১৩১২-১৩ (১৯০৫-০৬) দেশ-মাতৃকার অঙ্গচ্ছেদের বেদনায় "রবি-বাউল" যেন এক অভিনব সুরে আকাশ-বাতাসকে ভরিয়ে দিলেন: বাউলদের ভাটিয়ালি ও সারি গানের সুর—যেগুলি

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করেছিলেন। তার ফলে এমন কতকগুলি গান ও সুর পেয়েছি—যা খাঁটি বাংলার প্রাণের সুর—যেমন "আজ বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে" প্রভৃতি সত্যিই অতুলনীয়। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করেছেন। ১৩১২-১৩ রচিত কয়েকটি গান এখানে মনে করাতে চাই।

১। আপনি অবশ তবে বল দিবি তুই কারে? ২। নিশিদিন ভরসা রাখিস (৩) আমার প্রাণের মানুষ (৪) আমি ভয় করব না (৫) ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি: (৬) তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে তা'বলে ভাবনা করা চল্‌বে না। (৭) যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে চা' না; (৮) আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি; (৯) মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে; (১০) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা; (১১) যে তোরে পাগল বলে; (১২) বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি; (১৩) বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান; (১৪) বাংলার মাটি বাংলার জল।

সর্ব্বশেষে মনে পড়ে:

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে—

যে গান মহাত্মা গান্ধিকেও মাতিয়ে ছিল তাই বাংলা শিখে তিনি ঐ গানে যোগ দিতেন তাঁর উপাসনা সভায়। ২১ বছর

দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রাম করে গান্ধিজী যখন ১৯১৫ সনে ভারতে স্থায়ীভাবে নামলেন তখন সপরিবারে তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁকে "গুরুদেব" সম্বোধন করেন। বয়সে কবি-গুরুর চেয়ে মাত্র আট বছরের ছোট হলেও গান্ধিজী তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি করতেন এবং রাজনৈতিক তথা অন্য অনেকক্ষেত্রে তাঁদের মতভেদ থাকলেও পরস্পরের প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা তাঁরা পোষণ করতেন তা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। গান্ধিজীর নেতৃত্বে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসধারা এক সম্পূর্ণ নূতন খাতে বইতে সুরু করেছিল; কিন্তু মহাত্মাজী জানতেন সেই জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের দান কী অসামান্য। আজ সেই দুই মহাপুরুষকেই আমরা হারিয়েছি; তবু আজ এই কথা ভেবে সান্ত্বনা মেলে যে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরে "বন্দে-মাতরম্" গান ও তাঁর "জন-গণ-মন" (১৯১১) ও "দেশ দেশ নন্দিত করি" (১৯১৫) প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত মহাত্মাজী শুনে গেছেন ও জাতীয় নবজাগরণে তাদের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় অনুভব করে গেছেন।

১৮৭৪ সনে রচিত "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" থেকে সুরু করে শেষ পর্য্যন্ত যে সব স্বদেশী গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করে গেছেন সেগুলি স্বরলিপি সমেত প্রকাশিত করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব বলে মনে করি; তাই এদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলাম। রাজকোপে অনেক স্বদেশী গানের চয়নিকা লুপ্ত হয়ে গেছে; তবু সাময়িক পত্রিকা

ভাল করে ঘঁাটলে অনেক অপ্রত্যাশিত নূতন উপাদান ও তথ্য প্রকাশ হবে। এই আশা করে এই বিষয়ে আলোচনা তুললাম। আধুনিক স্বরলিপির প্রবর্ত্তক জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে প্রথমে সকৃতজ্ঞ প্রণতি জানাই; কারণ তিনিই স্বরলিপি ছাপা প্রসঙ্গে 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' গানটি বালক রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে প্রকাশ করে গেছেন; দুই ভাই সুরকার ও সুরশিল্পী, তাঁদের তরুণ জীবনের প্রেরণা ঢেলে দিয়েছেন কত গানে—বিশেষ 'স্বদেশী' সঙ্গীতে—তাও ভালভাবে আমাদের বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। তাঁদের প্রেরণায় ভাগিনেয়ী ও সুরশিষ্যা শ্রীমতী সরলা দেবী তাঁর "শত গান" স্বরলিপি প্রকাশ করেন ১৩০৭ সালে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সঙ্গীতসম্ভার কণ্ঠে কণ্ঠেই প্রধানতঃচলে এসেছে; অল্পসংখ্যক গানই স্বরলিপিতে উঠেছে; তাও প্রধানতঃ সরলা দেবী, প্রতিভা দেবী, ইন্দিরা দেবী ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একান্ত চেষ্টায়। কিন্তু কবিগুরুর স্বদেশী গান শতাধিক হলেও "গীত-বিতানে" মাত্র ৪৬টি স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে আবার প্রাচীন গানগুলি বেশীর ভাগই বাদ দেওয়া হয়েছে। 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র মত রবীন্দ্র-গীতলোকে সেই উপেক্ষিতাদের জন্য আমার মনটা কাঁদে, কারণ কবিগুরুর মুখে মধ্যে মধ্যে তাদের দু'এক কলি গাইতে শুনে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছি,—কী অপদার্থ ও অকৃতজ্ঞ আমরা যে সেই সব অমূল্য সম্পদ রক্ষা করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে আমরা পারিনি। স্বদেশীযুগে "মোমের" রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের নিজের সুর যা আমরা শুনেছি তাও লুপ্ত হয়েছে;

আধুনিক রেকর্ডে কিছু পুরাতন গান উঠছে সেটা আশার কথা (সুরের ব্যতিক্রম অবশ্য এখানেও আছে।) কিন্তু সর্ব্বদেশে যে স্বরলিপির ভিতর দিয়ে সঙ্গীতের সংরক্ষণ-প্রণালী গড়ে উঠেছে— তাকে অনাদর করলে আমাদেরই ক্ষতি ; এবং বহু ক্ষতি যে আজ প্রায় অপূরণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে—তাই শেষে মনে করাতে চাই ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করে। তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে সেকালে আমাদের পুরান গানের চর্চ্চা চলত ; হঠাৎ পরীক্ষকের মত ভঙ্গীতে তিনি একদিন আমাদের প্রশ্ন করলেন "রবীন্দ্রযুগের স্বদেশী গানের মধ্যে ক্ষুদ্র 'জোনাকি'ও মর্য্যাদা পেয়েছিল তা তোমরা জান কি ?" অর্ব্বাচীন আমরা সে ব্যাসকূটের কি জবাব দেবো ? তখুনি দিনুদা কোলে এস্রাজটা টেনে নিয়ে তাঁর সেই স্নিগ্ধ উদাস কণ্ঠে গান ধরলেন—আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনলাম :—

"জোনাকি ! কী সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ।
এই আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ ॥
তুমি নও ত সূর্য্য নও ত চন্দ্র, তাই বলেই কি কম আনন্দ
তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে আপন আলো জ্বেলেছ ॥
তোমার যা আছে তা তোমার আছে, তুমি নও গো ঋণী কারো কাছে
তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে তারি আদেশ পেলেছ ॥
তুমি আঁধার-বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠো, তুমি ছোট হয়ে নও গো ছোটো,
জগতে যেথায় যত আলো, সবায় আপন করে ফেলেছ ॥

এই অপূর্ব্ব বাউল সুরের গানটি গীত-বিতানের স্বদেশ-বিভাগ চ্যুত হয়ে 'বিচিত্র' বর্গের একটি কোণে স্থান পেয়েছে।

(গীত-বিতান ২ খণ্ড ৩০৬-৭ পৃঃ) এমনি কত স্বদেশী গান রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগে হয়ত লুকিয়ে রয়েছে ; সন্ধানী চোখ দিয়ে তাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং যথাসম্ভব খাঁটি সুরে তাদের স্বরলিপি—বাংলা ও নাগরী হরফে ছাপার আয়োজন করতে হবে। কারণ শুধু বাঙালী নয়, ভারতবাসী মাত্রই একদিন দাবী জানাবে এই সব গান শেখবার। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী নাগরী অক্ষরে 'সঙ্গীত গীতাঞ্জলি' প্রকাশ করেছিলেন বলে সেই অপূর্ব্ব গানগুলি আমি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কত অবাঙ্গালী নরনারীর মুখে শুনে মুগ্ধ হয়েছি। তেমনি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান সমগ্র জাতির সম্পদ মনে করে তার বৈজ্ঞানিক প্রচারের দায়িত্ব আমাদের নিতেই হবে। এদিকে বিশ্বভারতীর সঙ্গীত-নায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই গানগুলির ভিতর দিয়ে শুধু বাঙালী তার বাঙলা মায়ের অপূর্ব্ব মূর্ত্তিই দেখেনি, সেই রূপ ও সুর অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতা-চিত্রে, অগণ্য অনবদ্য রচনার ভিতর দিয়ে মানব-স্বাধীনতারই যেন প্রতীক হয়ে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকীর আগেই তাঁর স্বদেশী গানের পূর্ণ সঙ্কলন ও স্বরলিপি ছাপা হবে এই আশাই পোষণ করি।

রবীন্দ্রনাথের সাধন-সঙ্গীত

উনিশ শতকে চল্লিশ বছর (১৮৬১-১৯০১) কাটিয়ে 'সাধনা' পত্রিকার যুগ শেষ করে রবীন্দ্রনাথ যখন নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক হলেন, তখন থেকে যেন তাঁর জীবনের মোড় ফিরে গেল। বাংলা দেশের কোণ থেকে যে সব রচনা তিনি করেছেন ক্রমশঃ বাংলার বাইরে তার প্রচার বাড়তে লাগল। 'নৈবেদ্য' থেকে 'গীতাঞ্জলি' যুগের রচনাগুলি যখন নিজে ইংরেজীতে কবি রূপান্তরিত করলেন এবং ১৯১৩ সনে বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব পেলেন—তখন থেকে বাংলার কবিকে সবাই 'বিশ্বকবি' বলতে শুরু করল। কিন্তু বিশ্ববোধ ছিল তাঁর রক্তের মধ্যে এবং বিশ্বমৈত্রী, শুধু তাঁর কাছে তত্ত্বকথা নয়—সাধনালব্ধ সত্য। এই কথা বুঝতে হ'লে তাঁর শেষ চল্লিশ বছরের জীবনের সাধনধারাটি অনুসরণ করতে হবে। এ বিষয়ে তিনি 'শান্তিনিকেতন'-এর প্রাণস্পর্শী প্রার্থনাবলীর মধ্যে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। আর রেখে গেছেন তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের কণ্ঠে সাধন-সংগীতের অপূর্ব সুর-ভাষ্য। শান্তিনিকেতনের চালা ঘরে, সুরুলের দিকে এগিয়ে যাওয়া 'গ্রাম ছাড়া রাঙা মাটির পথ' বেয়ে, রবি-বাউল যে মূর্ত্তিতে আমাদের তরুণ জীবনে দেখা দিলেন, আজ বুঝি তিনিই সাধক রবীন্দ্রনাথ।

তাই বাংলার তথা ভারতের চিরন্তন সাধন ধারার সঙ্গে তাঁর এমন গভীর মিল—তখন অবশ্য ভাল করে বুঝিনি। তখনও শিল্পী রবীন্দ্রনাথই আমাদের মনকে মাতিয়ে আছেন। হঠাৎ দিনেন্দ্র-নাথের কাছে একটি পুরনো গান শুনলাম—

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে……।"

ললিত বিভাস রাগিণীতে কবির অশ্রুজল চিরন্তন হয়ে রয়েছে। শুনলাম এই গানটি রচনা করেন (১৯০২) পত্নীবিয়োগের সময়। এ গান শুনেছি কত ঘরে, যখন প্রিয়জন ঘরশূন্য করে চলে গেছেন। পত্নীবিয়োগের পর কন্যা রেণুকার ও শিশু-পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যু। বারে বারে কবির ঘরে মৃত্যু হানা দিয়েছে এবং নিজের জীবনের দুঃখ-বেদনাকে বিশ্বমানবের চিরন্তন সম্পদ করে তিনি রেখে গেছেন, তাঁর শেষ চল্লিশ বছরের ধর্ম্মসঙ্গীতে। ছোট প্রবন্ধে তার আলোচনা সম্ভব নয় জেনেও দু'চারটি কথা লিপিবদ্ধ করে যাই।

শান্তিনিকেতনের ছেলেদের নিয়ে কবি প্রথম অভিনয় করেছেন 'শারদোৎসব' (১৯০৮) অথচ উৎসবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গান যেটি প্রাণকে মোচড় দিয়ে উঠেছিল—

—"সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার
জননী গো গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার।"

ললিত-ভৈরবীর এই অপূর্ব আলাপ 'গীতাঞ্জলি'র রামকেলীতে রূপান্তরিত হয়েছে—

তিমির দুয়ার খোল, এস এস নীরব চরণে
জননী আমার দাঁড়াও
এই নবীন অরুণ কিরণে।"

গীতাঞ্জলির সুর-সৌধে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গোড়াকার কলা-বৈদগ্ধ্যও যেমন আছে তেমনি ভাবে ঢালা-বেদনায়-গলা কীর্তন-বাউলের সুরও আমরা পেয়েছি। ১৯০৫ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় এবং তাঁকে যে 'নৈবেদ্য' কাব্য তিনি উৎসর্গ করেন, সেই কাব্যের সুর উদাস ইমন-কল্যাণ যেন গীতাঞ্জলির প্রথম গানে (১৯১৩) পাই—

"আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ ধূলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।"

১৩১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন—

"সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার"

এবং ১৩১৫ সালে 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) নাটকে জোড়া গান একেবারে খাঁটি বাংলার বাউল—

"বাঁচান বাঁচি মারেন মরি
বল ভাই ধন্য হরি

ধন্য হরি ভবের নাটে
ধন্য হরি রাজ্য পাটে
ধন্য হরি শ্মশান ঘাটে
ধন্য হরি ধন্য হরি ॥"

পারিবারিক শোক ও মৃত্যুর মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপযুক্ত পুত্র রবীন্দ্রনাথ বৈদিক অদ্বৈত-তত্ত্বকে বৈরাগী-একতারার ছন্দে প্রকাশ করে গেছেন। এযুগে যে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে দেখলাম, কবির জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁকেই নানাভাবে দেখব।

আজ মনে পড়ে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ, গোলদিঘির উপর পুরানো সিটি কলেজের বাড়ীতে অদ্বৈত-বেদান্ত ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা রামমোহনের মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যে বিরাট সভা। বহুকষ্টে ভীড় ঠেলে আমরা উঠেছি—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষীরা অর্ঘ্য নিবেদন করলেন, তারপরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ। অগ্নিগর্ভ বাণী সকলের প্রাণকে যেন দীপ্ত ও পবিত্র করে দিল। সেই সিটি কলেজের হলেই আবার শুনেছি, কবির গদ্যছন্দে রচিত প্রবন্ধ 'তপোবন'। সেই সঙ্গে তাঁরই সে যুগের হাম্বীর রাগে গান—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

কলকাতার অলিতে-গলিতে তখন 'গীতাঞ্জলি'র গানের বন্যা বইছে। ১৯১০ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্মৃতি-সভায়, হেদুয়ার জেনারেল এসেম্ব্লি হলে, ছাত্রের দল আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনেছি বৈদিক সূত্রের রবীন্দ্র-ভাষ্য—

"কবির্মনীষী পরিভূঃস্বয়ম্ভূ।"

১৯১০ সালের মাঘোৎসব—ঠাকুর বাড়ীর তিন পুরুষের প্রতিনিধিদের প্রথম একত্রে দেখলাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি-সভায়—তাঁরই উদ্দেশ্যে রচিত—

"কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস"

বাউল গানটি গাইছেন দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ, তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুরু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ভাষণ দিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং উপাসনার শেষে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে, তাঁদের বড়দা ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম-সঙ্গীত গুজরাটি ভজন-সুরে গাইলেন—

"অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি
প্রণতি চরণে তব।"

সেই জোড়াসাঁকোর উঠোনেই ১১ই মাঘ সন্ধ্যায়—একেবারে বেদীর সামনে বসেছি; ডানদিকে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের শিল্পীদল, বেদীর বাঁ দিকে বহু গণ্য-মান্য লোকেরা বসেছেন আর সামনে ঠাকুর দালানে মেয়েদের ভীড়! রবীন্দ্রনাথ যেন উৎসবের

মর্মস্থলে রয়েছেন। অধিকাংশ গানই এবার তাঁর 'গীতাঞ্জলি' থেকে নেওয়া—

"আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।"

বাগেশ্রী রাগিনীর গম্ভীর ঝঙ্কারে সে বন্দনা সকলের প্রাণকে যেভাবে নাড়া দিয়েছিল তা' জীবনে ভুলব না। এই রাগিনীতে রবীন্দ্রনাথ বেশী গান রচনা করেন নি, বোধহয় সেইজন্যেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ঐ গানটি শেখবার জন্যে। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের নিয়ম মত মৃদঙ্গের সঙ্গতে গান গাওয়া হয়েছিল। জয়জয়ন্তী রাগিনীতে আর একটি গান ১৩১৬ সালে রচিত—কিন্তু যেটি পরে মহাত্মাজীর উপাসনার সংগীত হয়েছিল—সেদিন প্রথম শুনি: 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো'। আবার সেই সময়েরই রচনা অপূর্ব কীর্তন: 'তুমি এবার আমায় লহ, হে নাথ লহ।' নিজের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে ভূমাকে পাওয়া ও বিশ্বমানবের মধ্যে তাঁকে চেনা ও স্বীকার করা—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ৪৯।৫০ বৎসরের ছুটি ভাবণের মর্মকথা—যেগুলি পরে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে ছাপা হয়েছে 'বিশ্ববোধ' ও 'আত্মবোধ'রূপে (১৯১০-১১) সনে। গীতাঞ্জলির বেশীর ভাগ গানই ১৩১৬-১৭ সালের রচিত এবং ভাবের গভীরতায় ও সুর-বৈচিত্র্যে অনুপম।

কবির ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসবে প্রথম শান্তিনিকেতনে কিছু-দিন কাটিয়ে আভাসে বুঝলাম, কোথায় কবির প্রেরণার উৎস—সেই ছোট শিশুদের শিক্ষা-যজ্ঞে, তপোবনের উদার দৈন্যে ও জন-কল্যাণ সাধনায়। অর্থ দিয়ে এই প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্রনাথ গড়েন নি—তা প্রথমবারেই অনুভব করেছিলাম। অথচ আত্মার ঐশ্বর্যবলে সেকালের ব্রহ্মচর্য-আশ্রম দেশী, বিদেশী সকলের শ্রদ্ধা জাগিয়েছিল। ১৩১৮ সালের মাঘোৎসবে আবার সুরের সুরধুনী বইয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

"তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তাঁর
পায়ের ধ্বনি, ঐ সে আসে আসে আসে

(ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ)

"যতবার আলো জ্বালাতে যাই,
নিভে যায় বারে বারে
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।"

(তিলক কামোদ)

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে"—

"এই করেছ ভালো নিঠুর!
এই করেছ ভাল!
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।"

"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর!
তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

এমনি কত ভাবের, কত সুরের গান দিয়ে কবি বিশ্বদেবের বন্দনা করে গেছেন। সেই সাধনার উত্তরাধিকার বাঙ্গালী তাঁর সুর ও ভাষার মধ্যেই পেয়েছে; তার কতটুকু বাঁচিয়ে রাখতে পারবে—অনাগত যুগের মানুষদের দিয়ে যেতে পারবে—সেই তো রবীন্দ্রোত্তর যুগেবসমস্যা।

১৯১১ অর্থাৎ ৫০ বছর বয়সেও কী গানের গলা কবির ছিল, যারা কানে না শুনেছে, শুধু পড়ে বুঝবে না। আজও মনে হয় শুনতে পাচ্ছি—উৎসব প্রাঙ্গণের বিরাট ভীড় যেন মিলিয়ে গেছে চরম স্তব্ধতায়! সমবেত সঙ্গীত চলছে—ছায়ানটের গম্ভীর গমকে—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"—

হঠাৎ বেদী থেকে কবি 'কোরস্'-নেতা দিনেন্দ্রনাথের পানে তাকালেন—তাঁরা থেমে গেলেন; এবং গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠে কবি একা—প্রেমভক্তি রাগে গাইলেন সঞ্চারীর দুটি লাইন—

"তোমায় আমায় মিলন হলে
সকলি যায় খুলে
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।"

সমস্ত প্রাঙ্গণ ভরে গেল তাঁর একক কীর্ত্তনে। সেই সুর এখনও কানে রয়েছে—জীবনে ভোলা সম্ভব নয়

২২শে শ্রাবণ (১৩৪৮ সালে) আমাদের আগুনের মতই পুড়িয়েছিলেন— সেই দারুণ দিনে গুরুদেবকে আমরা হারিয়েছি —সে কথা মনে এল হঠাৎ বহুকাল পরে গীতাঞ্জলি নাড়তে। দেখি ১৩১৭ সালের ২২শে শ্রাবণেই তিনি দুটি গান রচনা করেন এবং আমাদের শুনিয়েছিলেন—

'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে— ।'

এবং

'জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।'

এ গান অনেকের জীবনেই স্পর্শ করেছে ও বহুকাল করবে।

কবির পঞ্চাশ বৎসরের উৎসব শান্তিনিকেতনে হয়ে গেল; তার পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে এবং ঠাকুর বাড়ীর বন্ধু নাটোর-মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ও বাংলার সাহিত্যসেবীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক'লকাতা টাউন হলে বিরাট সভায় বাংলার রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব হ'ল। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অভিভাষণ পাঠ ক'রে—'শঙ্কর তোমাকে জয়যুক্ত করুন' বলে সারা বাংলার হয়ে জয়ধ্বনি করেছিলেন সেকথা মনে আছে। তার মধ্যে ছোট্ট একটি মানুষ দাঁড়িয়ে উঠতে সকলে স্তব্ধ হয়ে শুনছি—তিনি ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

রবীন্দ্রনাথের দাদাদের যুগের মানুষ। সেদিন তিনি মনে করিয়ে দিলেন, ১৮৮১ সনে কবির প্রথম সঙ্গীত-নাট্য রচনা 'বাল্মীকি-প্রতিভা' শুনে তিনি চার লাইন কবিতা লিখেছেন এবং সেইটি পাঠ করেই পঞ্চাশ বৎসরের কবিকে উপহার দিলেন।

উৎসবের পরই কবির বিলাত যাবার কথা। কিন্তু হঠাৎ তাঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়ল। ১৩১৮ সালের চৈত্র মাস তিনি কাটালেন শিলাইদহে এবং সেখানে যেন গানের চৈতালী রচনা করলেন—

"আমি হাল ছাড়লে তবে

তুমি হাল ধরবে জানি।"

পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে কবি বিশ্বকবির হাতেই নিজেকে যেন উৎসর্গ করে দিলেন। 'দেখা অদেখায় মেশা' সেই মধুর সম্বন্ধ অতি সরল শিশুদের সুরে পদযোজনা করেছিলেন—

"সারাদিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা

শুভক্ষণ হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা।"

এপারে বসে আবার ওপারের টান অনুভব করতেন বলে কবি গেয়ে উঠতেন—

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার

এই তরী।

তীরে বসে যায় যে বেলা

মরি গো মরি।"

৩০শে চৈত্র, ১৩১৮ সালে শিশুর মত আনন্দে তিনি গেয়ে উঠেছেন—

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর।"

১৩১৯ সালের বৈশাখ এল, তাঁর জন্মদিন এবার কেবল কয়েকজন অন্তরঙ্গদের নিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে হ'ল—কারণ জাহাজ ঠিক হয়ে গেছে—কবি পাড়ি দেবেন। কবিভক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত একটি কবিতাতে দিনেন্দ্রনাথ সুর দিয়ে গাইলেন। যাবার আগে কবি অপূর্ব সুরে পুরনো কালের ঠাটে রচিত কয়েকটি গান রেখে গেলেন—আজ মনে করিয়ে দিই—

"কে গো অন্তরতর সে?
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।" (ইমন-কল্যাণ)

তার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রিয় গান—

"তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে।"

৯ই বৈশাখ রচনা করেছেন নিবিড় বেদনায় ভৈরবীর মীড়ে—

"পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।"

সেকালের শান্তিনিকেতনে নব-নব রচিত সঙ্গীতের পসরা বয়ে নিয়ে কলকাতায় আমাদের উপহার দিতেন—দুজন

আশ্রমবন্ধু, যাঁদের দাক্ষিণ্য চিরদিন সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করব— একজন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একজন পঞ্চাশ বছরের উৎসব উপলক্ষ্যে প্রথম রবীন্দ্র-কাব্য-বিশ্লেষক অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী। আজও শুনতে পাচ্ছি গুন গুন করে আমাদের শোনাচ্ছেন ছায়ানট রাগ রচিত নূতন গান—

আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।"

এই গানটি বিশ্বের দরবারে প্রথম পৌঁছবে ইংরেজী ভাষায়, কারণ রবীন্দ্রনাথ এই গানটি দিয়েই সুরু করেছিলেন তাঁর ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি' যেটি প্রথম পড়েন শিল্পী Rothenstein এবং তিনি পড়তে দেন আয়ারলণ্ডের মুখ্য কবি Yeatsকে। তাঁদের মনকে কতখানি নাড়া দিয়েছিল, তাঁদের কাছে সুরহারানো অথচ ভাবে ভরা এইসব রবীন্দ্র-সঙ্গীত, তার প্রমাণ রয়ে গেল, Yeatsএর ইংরেজী ভূমিকায় ও সুইডেনের নোবেল একাডেমীর সদস্য Per Halstrom লিখিত Nobel Academy-প্রশস্তিতে। কবি ১৯১৩ সনে দেশে ফিরে টেলিগ্রামে খবর পেলেন তাঁর সাধন-শিষ্যা 'গীতাঞ্জলি' নোবেল পুরস্কারে সম্বর্ধিত হয়েছে। বাঙালী কবি গান ও সুরের যাদুমন্ত্রে বিশ্ব জয় করে বাংলাকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে চিরস্থায়ী আসন দিলেন।

১৯১২-১৩ সত্যই কবির জীবনের জয়যাত্রা। ৩রা জুন দেখছি যাবার মুখে লোহিত সমুদ্রে জাহাজে বসে রচনা করছেন—

"প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হারিয়ে
মোরে আরো আরো দাও প্রাণ।"

লণ্ডনে পৌঁছেচেন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক মহলে, বিরাট সম্বর্ধনা হচ্ছে—তার মধ্যেই পালিয়ে এসে যেন তাঁর নিভৃত প্রাণের দেবতার কাছে কবি গাইছেন—

"এ মণিহার আমায় নাহি সাজে···
তোমার কাছে দেখাইনে মুখ
মণিমালার লাজে।"

হঠাৎ মনে পড়ে গেল কবি ফিরে আসার পর তাকে নিয়ে আমরা ঘিরে বসেছি, তাঁর একপাশে মনোমোহন ঘোষ, অন্য পাশে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তাঁরাও আমাদের সঙ্গে মিলে জিদ ধরলেন—কবি একটি গান করুন। কবি কেন যে গেয়েছিলেন—'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে'—তা অনেক পরে বুঝেছি। সেপ্টেম্বর ১৯১৩ সনে 'সিটি অফ লাহোর' জাহাজে কবি দেশে ফিরছেন; সেই লোহিত সমুদ্রে সূর্যাস্তের বিষন্ন বর্ণচ্ছটায় সুর বেঁধে লিখলেন—

"জানি গো দিন যাবে এ দিন যাবে···
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে

থাকতে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে
ভরতে পারি ডালা।"

একদিকে বিদায়ের সুরু আর একদিকে নূতন প্রাণের প্রেরণা নিয়ে কবি বাহান্ন বছর বয়সে বাংলায় ফিরে এলেন। মাটিতে পা দিতেই শান্তিনিকেতন যেন তাঁকে সঙ্গীতমুখর করে তুলল। এমন গান লিখলেন—'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি', যুগে—যার তুলনা পাই না :

"যদি প্রেম দিলে না প্রাণে,
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে
এমন গানে গানে।"

কবির তরুণ জীবনের প্রিয় সুর সিন্ধুরাগের সঙ্গে কাফি মিলিয়ে এমন এক মিশ্র রাগিনীর সৃষ্টি এই গানে করলেন, শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। সুরের প্রতি মীড় ও মূর্চ্ছনা পদকর্তা রবীন্দ্রনাথকে অভিনব সুরস্রষ্টারূপে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দেখাল। সেবার মাঘোৎসবে ৺অমলা দাশের ভাগিনেয়ী সাহানা দেবীকে কবি এই গানটি শিখিয়ে গাইয়েছিলেন। সাহানার কণ্ঠে সে গান যেন আকাশ-বাতাশ ভরিয়ে দিয়েছিল। সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন উপস্থিত ছিলেন এবং শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর এস্রাজ সংগত করতে করতে স্নিগ্ধ পরিহাসের সুরে প্রশ্ন করেছিলেন—

"দীনেশ বাবু, আপনি আমি ত অনেকদিন থেকেই লিখি,

কিন্তু এত সহজ কথায় বুক-ভরানো সুর শুনেছেন নাকি?—

"যদি প্রেম দিলে না প্রাণে,

কেন আকাশ ভবে এমন চাওয়া চায় এ মুখের পানে?

১৩২০ সালে ৭ই পৌষের উৎসবে শান্তিনিকেতনে গিয়ে এবং সেখান থেকে ফিরে শুনলাম কলকাতার মাঘোৎসবের মধ্যে কবির নব রচিত গানগুলি। কবি তাঁর গভীরতম ধর্ম্মবোধকে কত সহজ ও সরল করে আমাদের মত লক্ষ লক্ষ অপদার্থের প্রাণে তার চিরন্তন বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন, সে যেন তাঁর সুরের মোহমন্ত্রে। ১১ই মাঘ ভোরবেলা চিৎপুর রোডের উপরকার আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে কবিকে ঘিরে সকলে বসেছি—তিনি তন্ময় হয়ে একা গেয়ে গেলেন—

—ভোরের বেলায় কখন এসে

পরশ করে গেছ হেসে।

টোড়ি ভৈরবীর মিশ্র আলাপে সেদিনকার সকাল যেন এক অভিনব তাৎপর্যে ঝলমল করে উঠল। উপাসনার মধ্যে আবার গান—

..."যে সুর ভরিলে ভাষা-ভোলা গীতে

শিশুর নবীনজীবন-বাঁশিতে

জননীর মুখ তাকানো হাসিতে

সেই সুরে মোরে বাজাও।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পাথরের বেদীর পাশে সেই গান, যেখানে শুনেছি—সে বাড়ীর পাশ দিয়ে জোড়াসাঁকোর মহর্ষি-ভবন

যেতে গেলে আজ চোখে জল আসে। এটা এখন ভাড়াটে বাড়ী ভজন, সাধন, সুর কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে এই তীর্থস্থান থেকে!

১৯১৪ সনে ১১ই মাঘোৎসবে আবার নূতন সুরের ঢেউ বয়ে গেল। শিশুরা না বুঝেই ব্রহ্ম সঙ্গীত গাইছে—

"তোমারি নাম বলব নানা ছলে...
শিশু যেমন মাকে
(শুধু) নামের নেশায় ডাকে
বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের
নাম সে বলে।"

একদিকে যেমন সবাইকে বোঝাবার মত সরল গান তাঁর একদিকে তারি পাশে দুঃখের অভিসার-রাগিনী, মার্গ-সঙ্গীতের গাম্ভীর্য্য নিয়ে গর্জে উঠল—

"লুকিয়ে আসো আঁধার রাতে
তুমিই আমার বন্ধু।"

মিশ্র সিন্ধুতে সুগভীর আলাপ, তার মধ্যে আমাদের জন্ম-মৃত্যুর সমস্যাও কবি অনুভব করেছেন। পরোজতেওরা-ধ্রুপদ একটি উৎসবে শোনা গেল—

"যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে,
যবে পরিচিতের কোল হতে সে কাড়ে
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ॥"

গানে যেমন মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া, তেমনি 'বলাকা'র

কবিতায় এক নূতন সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই কবি লিখেছেন—

"এবার বুঝি এল সর্ব্বনাশ গো!"

বলাকার পাঠকেরা এ কবিতাটি চিনবেন। বলাকার কোনো কোনো কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অনেক পরে সুর দিয়েছেন, যথা—

"তুমি কি কেবলি ছবি?"

কিন্তু তার মধ্যে একটি মাত্র গান ছিল, সেটি তিনি দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে সে যুগে গেয়েছিলেন—

"আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি
আজি আমার ব্যথার বাঁশিতে।"

১৯১৪-১৬ সনের তিনটি মাঘোৎসবে এবং মাঝে মাঝে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের জলসায় ভক্ত রবীন্দ্রনাথ যে সম্পদ ছ'হাতে বিলিয়ে গিয়েছিলেন তা সত্যিই অমূল্য।

'আনন্দময় নীরব রাতে নীবব আঁধারে',

ইমনরাগে কবি একাই গাইছেন—যেন বিশ্বের সুর-সাধকের হয়ে—

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে,
আমার সুরগুলি পায় চরণ আমি
পাই না তোমারে।"

প্রাণের গভীর বেদনা আবার পূরবীতে রূপ নিল—

"সন্ধ্যা হোল গো—
ওমা সন্ধ্যা হোল বুকে ধর

অতল কালো স্নেহের মাঝে
ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর।"

বেদনাকে জয় করে রবি-বাউল আবার গেয়ে চলেছেন :

"তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে
গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল
কত আলোর সঙ্গ।"

সুরের সঙ্গে যেন একতারা হাতে করে কবি নৃত্য করে গাইছেন—

"তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে
দিলে মোর প্রাণে।"

আগুন পোড়ায়, তা আমরা জানি; কিন্তু খাদগুলো পুড়ে খাঁটি সোনা হওয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে, তা রবীন্দ্রনাথ সুরের সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন! এত বয়সেও দাহনের শেষ নেই। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা (মাধুরী চক্রবর্তী) ক্ষয়রোগে শয্যাশায়িনী—তাঁকেও বিদায় দিতে হ'ল। তাই কি ১৩২১-এর শ্রাবণে (যে মাসে আমরাও কবিকে হারালাম) রচনা করেছিলেন :

"দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ থামল।"

লিখেছেন—

"…ব্যথাপথের পথিক তুমি
চরণ চলে ব্যথা চুমি,
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার
চিরদিনের তরে গো, চিরজীবন ধরে।"

এই গানটি নিজ হাতে কবিগুরু আমাকে লিখে দেন (আমার পরলোকগত সহোদর গোকুলচন্দ্র নাগের অন্তিমশয্যার পাশে এটি রেখেছিলাম)। ভাদ্র মাসে কবি শান্তিনিকেতন ও সুরুলে (শ্রীনিকেতনের আদি কেন্দ্র) বসে দুঃখ-সুখের কত গানই রচনা করেছেন:

"ও নিঠুর আরো কি বাণ তোমার
তূণে আছে?
তুমি মর্মে আমার মারবে
হিয়ার কাছে?"

সুরুলের গ্রামে সেকালে রবীন্দ্রনাথ পাখীদের সঙ্গে সত্যিই পাখী হয়েছিলেন, সেকথা এখন হয়ত অনেকে পরিহাস মনে করবেন, কিন্তু আমরা এক বিরাট গাছের ডালের উপরে তাঁর কাঠের বাঁধা বাসায় অনেকদিন গল্প করেছি। সেখানেই লেখা অপূর্ব সাধন-সঙ্গীত—

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য কর দহন-দানে।"

তাঁর গলা থেকে সেই বেহাগের আলাপ বুকটাকে মোচড় দিয়ে উঠেছিল, আজও ভুলিনি। সুরের সংমিশ্রণে একদিকে যেমন

এক নূতন রবীন্দ্র-কীর্তন গড়ে উঠছে, তেমনি বড় বড় মার্গ-সঙ্গীতের ছন্দেও তিনি বন্দনা লিখেছেন—

"শুধু তোমার বাণী নয় গো
হে বন্ধু, হে প্রিয়
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।"

কানাড়ার আলাপে কবি আমাদের প্রাণকে কাঁপিয়ে তুলেছিলেন। সাহানার সঙ্গে কানাড়া মিলিয়ে তিনি আলাপ করে বলেছেন—

যন্ত্রী! আমরা ত তোমার হাতেরই যন্ত্র?

গানের ঘোরে সেকালে আমাদের দীন জীবনের কত সন্ধ্যার বর্ণচ্ছটা, কত রাত্রির অন্ধকার যেন কবির বাণীতে ও সুরে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। আড়ানা রাগে গর্জন করে কবি কখনো গাইছেন—

"যেতে যেতে একলা পথে
নিভেছে মোর বাতি,
ঝড় এসেছে ওরে এবার
ঝড়কে পেলেম সাথী॥"

আবার নিবিড় ব্যথার আলাপে গেয়েছেন—

"না বাঁচাবে আমায় যদি
মারবে কেন তবে?"

১৯১৪ সনের এম-এ পরীক্ষা দিয়ে বন্ধুবর অরুণচন্দ্র

সেন ও আমি শেষ দিনের প্রবন্ধ পরীক্ষায় 'আন্তর্জাতিক সমস্যা' নিয়ে লিখতে বসেছি, সেই দিনই খবর এল বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়েছে।

"ঘরে ঘরে শূন্য হোল আরামের শয্যাতল
মা কাঁদিছে পিছে, প্রেয়সী দুয়ার-পাশে নয়ন মুছিছে।"

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ভিত্‌টা ফেটে গিয়ে এক বিরাট বিপ্লব রাশিয়ায় দেখা দেবে অক্টোবর ১৯১৭ সালে। অথচ ৪ঠা ভাদ্র, ১৩২১ (আগষ্ট ১৯১৪) কবি লিখছেন—

"লুঠ-করা ধন করে জড়"
কে হ'তে চাস্ সবার বড়,
এক নিমেষে পথের ধূলায় পড়তে হবে।
বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে!'

মানুষ মরণ-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল—তার মধ্যেই আশা ও আশ্বাসের বাণী গেঁথে কবি গাইছেন—

'ওরে ভীরু তোমার হাতে নাই
ভুবনের ভার,
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।'

অন্ধকারের পরপারে মানুষকে নিয়ে যাবার জন্য বৈদিক ঋষির মতই রবীন্দ্রনাথ উদাত্ত সুরে গাইলেন—

"ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।"

৩০শে আশ্বিন (১৩২১) প্রয়াগ তীর্থে এ গান কবি কেন লিখেছিলেন জানি না। জানতাম সেবার পূজার ছুটিতে—হয়ত বিশ্বব্যাপী নরমেধ-যজ্ঞের মধ্যে শান্তি পাবার জন্যে—কবি বুদ্ধ-গয়ায় করুণাবতার বুদ্ধকে প্রণাম করে গয়া অঞ্চলে অনেকগুলি গানের অর্ঘ্য রচনা করেন; আর প্রয়াগে এসে লেখনে :—

"এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারাজীবনের অন্তরের অনির্ব্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যা-দীপ-মুখে
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত।"

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫তে মহাত্মা গান্ধী ও কস্তুরবা, প্রথম এলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁদের পুত্র দেবদাস এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আরো কয়েকজন আশ্রমের ছাত্রদের কবিগুরু আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে গান্ধীজি বারে বারে গুরুদেবকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। সেকালে রবীন্দ্রনাথ সুরুলের গ্রামে বসে 'ফাল্গুনী' নাটকটি লিখেছেন এবং শান্তিনিকেতনে একবার অভিনয়ও করেছেন। ১৯১৬ সালে মাঘোৎসবের পর বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে অর্থসাহায্যের জন্য 'ফাল্গুনী' অভিনয় করে প্রায় হাজার দশেক টাকা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে

কবি নিয়েছিলেন। এই নাটকে 'শ্রুতিভূষণ' এর ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথকে এবং অন্ধ বাউলরূপে কবিকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা হয়ত স্বীকার করবেন যে, চন্দ্রহাসের মত মৃত্যুর অন্ধকার গহ্বর পার হয়ে জ্যোতির্ময় অমৃতলোকের সন্ধান পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঋষিত্ব লাভ করেছেন। একতারা হাতে সেই বাউলের গান— এখন থেকে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত—আর এক অভিনব তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিল।

"জয়ী প্রাণ চির প্রাণ
জয়ী রে আনন্দ গান..."

১৯১৬ সনে দ্বিতীয়বার জাপান-ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে ১৯১৭ সনে রবীন্দ্রনাথ "ডাকঘর"-এর অপূর্ব অভিনয় দেখান এবং ১৭ই ডিসেম্বর কলকাতা কংগ্রেসের শেষে সভানেত্রী এনি বেসান্ত ও মহাত্মা গান্ধীর সামনে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আবার 'ডাক-ঘরের' অভিনয় করেন। অবনীন্দ্রনাথের 'মোড়ল' এবং কবির বাউলের ভূমিকা ও সেদিনের গানগুলি জীবনে ভুলব না—

"ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি
কে আমারে (বন্ধু আমার)।"

যুদ্ধের দরুণ রাজনৈতিক অশান্তি চলছে। ১৬ই মে ১৯১৮তে জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার মৃত্যু কলকাতায় বসেই রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। সেই শোকের মধ্যে যতবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, মনে হয়েছে তিনি যেন সুরকে

আশ্রয় করে জন্ম-মৃত্যুর উপরে চলে গেছেন এবং গান গেয়েছেন :

'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয় ?
জয় অজানার জয়।'

গীত-বীথিকায় প্রথম গান—

"মাটির প্রদীপখানি" যেন রূপক হয়ে দেখা দিল।

'আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে
দিবস গেলে করব নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।"

১৯১৭ সালে 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধে জুড়ে দিয়েছিলেন অপূর্ব পূরবী রাগিনী—

"অশ্রু নদীর সুদূর পারে
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।"

বেদনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৃজন-প্রতিভার অপূর্ব বিকাশ সে যুগে দেখেছি।

১৯১৮তে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা ও ঘরোয়া-ভাবে তার প্রতিষ্ঠা হয়, যদিও তিন বছর পরে ১৯২১-এর ডিসেম্বরে নিমন্ত্রণ করে তিনি বিশ্বভারতীকে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দেন। তার আগে রাউলট্ বিল ও পঞ্জাবের নির্মম হত্যার প্রতিবাদ হিসাবে ২০শে মে, ১৯১৯ সালে—৫৮ বৎসর বয়সে কবি 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। ১৯২০-এর মে মাসে ৫৯ বৎসর পূর্ণ

করে চতুর্থবার ইউরোপ যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে সেখানে মেলবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেবার বিশ্বযুদ্ধের দুই শত্রু-ভ্রাতা ফরাসী ও জার্মাণদের যেন মেলাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ দুই দলের মনীষীদেরই বিশ্বভারতী উৎসবে নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং তাঁর বন্ধু রম্যা রলাঁর মতই সমন্বয় ও মৈত্রীর বাণী শুনিয়ে জার্মাণী ও ফরাসী দুই দেশেই তাঁর ষষ্ঠীপূর্তি উৎসব, (মে ১৯২১) কবিকে নিয়ে, আমরা করেছিলাম। সেবারের উৎসবে আমাদের সম্বল ছিল জাতীয় সঙ্গীত 'জন-গণ-মন' —অপটু কণ্ঠে সে গান গেয়ে ইউরোপীয় বন্ধুদের শুনিয়েছি।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভূমিকা হিসাবে যে চারটি ধারা এ পর্য্যন্ত অনুসরণ করা গেল, সেভাবে আরো কিছু তাঁর সুরের সুরধুনীতে পাই। কবি নিজেই তাঁর "গীত-বিতান" সুরু করেছেন 'পূজা' পর্য্যায় দিয়ে এবং সেই গম্ভীরভাবে প্রথম খণ্ড প্রায় ভরা। সাধক রবীন্দ্রনাথকে ধরতে হলে এই গানগুলি নিয়ে সাধন করতে হবে জপমালার মতন। তিনি নিজেই যেন নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন একটি বন্দনায়—পূরবী-শ্রী রাগ মাধুর্য্যে প্রদীপ্ত—

নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা
ভক্ত সেথায় খোলো দ্বার, আজ লব তাঁর দেখা

* * *

যেথা নিখিলের সাধনা পূজা-লোক করে রচনা
সেথায় আমিও ধরিব একটি জ্যোতির রেখা।

ভাষার যাদুকর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ভাষার মোহ কাটিয়ে সুরের একতারা বাজিয়ে কেন রবি-বাউল হয়ে উঠেছিলেন, কেন, তাঁর গভীরতম দার্শনিক সন্দর্ভ—মানুষের ধর্ম্ম (Religion of Man) রচনার মধ্যে বারে বারে নিরক্ষর আউল-বাউলদের গানগুলির উদ্ধৃতি দিয়ে গেছেন, সবই আমরা বুঝতে পারব যদি তাঁর সাধন সঙ্গীতগুলি শুধু কণ্ঠে নয়, প্রাণের তারে আমরা তুলে নিতে পারি। কত গুরুগম্ভীর রচনা ও আলোচনার মধ্যে শুনে চমকে উঠেছি, তিনি তন্ময় হয়ে গাইছেন—

শেষ পারাণীর কড়ি কণ্ঠে নিলেম
গান কণ্ঠে নিলেম।

আবার শেষ বিদায়ের পর যে গান গাওয়া হবে—২২শে শ্রাবণের সেই গানও সাধক রবীন্দ্রনাথের দান—

সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার

শৈশবে কোন পুণ্য লগ্নে সাধক পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক স্পর্শ প্রাণে লেগেছিল, উপনিষদের কবি থেকে মরমী হাফেজ ও লালন ফকীর পর্য্যন্ত কত ভক্ত-সাধকদের প্রেরণা এসে মিলেছে রবীন্দ্রনাথের সাধন সঙ্গীতে, তা ভেবেই পাই না। বাঙলা ভাষা ও সুরের ভিতর দিয়ে এটি বিশ্ব-মানবের চিরন্তন সম্পদ হয়ে রইল।

গীত-বিতানের দ্বিতীয় পর্ব্বে পাই দুটি সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশ - 'প্রকৃতি' ও 'প্রেম'। অনুপম তাঁর প্রেম-সঙ্গীত, বিচিত্র মীড়ে মূর্চ্ছনায়, ভাবে ও রসে ভরপুর; সেই ভানুসিংহের যুগ থেকে সুরু ক'রে জীবনের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি প্রেমের জয়ধ্বনি ক'রে গেছেন, ফাল্গুনীর বাউলের মত—

জয়ী প্রাণ জয়ী প্রাণ—
জয়ী রে আনন্দ গান
জয়ী প্রেম চির প্রেমে
জয়ী জ্যোতির্ম্ময় রে।

এ জীবনের ক্ষণভঙ্গুর পেলব প্রেম নিয়ে যেমন বহু অপূর্ব্ব রচনা তিনি রেখে গেছেন, তেমনি প্রেমকে তুলেছেন ভূমায় অর্থাৎ চিরন্তন মহিমায়, সেখানে প্রেম যেন রূপান্তরিত

হয়েছে পূজায়—তাই তাঁর অনেক প্রেমের গান প্রার্থনার সঙ্গে মিলে যায়; মনে পড়ে তিনি যৌবনেই লিখে গেছেন—

দেবতারে প্রিয় করি
প্রিয়েরে দেবতা।

সেই 'সোনার তরী'র কবিই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' লিখেছিলেন।

'প্রকৃতি' পর্য্যায়ের গানগুলির কোথায় সুরু আর কোথায় শেষ, সেটা আজও কেউ ভেবে পান না; কারণ প্রকৃতির আপন-শিশু রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁরই ভাষা, সুর ও ছন্দ নিজ-রচনায় প্রকাশ ক'রে গেছেন। কিন্তু তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনায় প্রকৃতির যে পরিচয় পাই, তার সঙ্গে মিল ও গরমিল সমেত অনেক তুলনা ও বিচার করা যায় পৃথিবীর অনেক Nature-Poet-দের সঙ্গে; সে তুলনায় রবীন্দ্রনাথ কখনো উঠেছেন বা নেমেছেন। কিন্তু 'ভাষার অতীত তীরে' তাঁর মিলন প্রকৃতির সঙ্গে! তিনি যেন তাঁর এক নিজস্ব ভাষায় কথা বলেছেন এই শিশু ভোলানাথের সঙ্গে—সে ভাষার ব্যাকরণ কি, আমরা জানি না; কিন্তু অর্দ্ধেকের বেশি ছন্দ ও সুর হয়তো জেগেছিল শিশু-কবির প্রথম আবৃত্তি 'জল পড়ে—পাতা নড়ে'—পদেই। কবিতার ছন্দ হ'তে তাঁর আরও দেরী হয়েছিল, কিন্তু সুর জেগেছিল শিশু রবির কণ্ঠে—সেই সঙ্গে সুরের নানা ছন্দ—যার বিশ্লেষণ করেছেন বহু পরে 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধে (১৯১৭)। যে প্রবন্ধটি পাঠ করার সঙ্গে তিনি নিজে গেয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মামুলী তাল ও ছন্দ বিষয়ে তাঁর রস-বোধ কোন্ অনির্ব্বচনীয় লোকের। এক্ষেত্রে দুঃসাধ্য

সাধন করেছেন রবীন্দ্রনাথ শুধু কণ্ঠে ও কানে সুর ধরে (কোনও যন্ত্র তিনি বাজাতে শেখেন নি।) তিনি 'কানের ভিতর দিয়া' মরমে পশেছিলেন, তাই দু'হাজারের ওপর গানই রচনা করে গেছেন। যে-কথা শুনে পাশ্চাত্ত্য সুরকাররা অনেকে অবাক হয়েছেন : মণীষী রম্যা রলাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আমি অনেক আলোচনা করি এবং Fox strangway ও Arnold Bake-র পাশ্চাত্ত্য স্বরলিপি সহ আলোচনাগুলির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমাদের জাতীয়-সঙ্গীত "জনগণ"—Variations যেমন যন্ত্র-সঙ্গীতের জন্য লেখা সুর হয়েছে তেমনি পুব-পশ্চিমের বড় সুরকার (Composer) ও যন্ত্রীদের আদর্শে জাতীয় 'অর্কেষ্ট্রা' যখন আমরা গড়ে তুলতে পারব, তখন সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথের আর এক মহান পরিচয় মিলবে। দুর্ভাগ্যের কথা যে, কিছু 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত' চলচ্চিত্রে ঢুকেছে শুধু দোহারকী বা জুড়িদার হিসাবে ; কিন্তু তাঁর পূর্ণ সম্ভাব্যতা নিয়ে গবেষণায় কোনও আয়োজন এ পর্য্যন্ত করা হয়নি। অথচ মারাঠী ও কর্ণাটী সুর-ধারা অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ কতগুলি অপূর্ব রচনা করে গেছেন, যথার্থ কলাবিদ্ যন্ত্রীরা যার তাৎপর্য্য বুঝবেন। সেটি আমাদের বুঝাবার জন্যই যেন তাঁর প্রকৃতি-শীর্ষক গানগুলির প্রথমেই রেখেছেন তাঁর যৌবনকালের সুর রচনা—

বিশ্ব বীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে।

স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরিগুহা পারাবার
নিত্য জাগে সরস সংগীত মধুরিমা
নিত্য নৃত্য-রস ভঙ্গিমা……

এই ভাবের অনুসরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সঙ্গীত ও ভাব', 'ভাষা ও ছন্দ', 'বিশ্বনৃত্য', 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রভৃতি অগণ্য রচনায়। সেই উদার পটভূমিকায় দেখতে হবে কবির গগনস্পর্শী মার্গ-সঙ্গীতের সুরসৌধ যেন Browning-এর 'Palace of Music'.

আবার 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' পর্য্যায়ের দেশী বাউল-কীর্ত্তন-ভাটিয়ালীর মিশ্রণে এক অপূর্ব্ব রবি-কীর্ত্তনও তাঁরই দান, এ-কথা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করবেন লোকনৃত্য ও গণনাট্য-সঙ্গীতের উদ্যোক্তারা। হয়তো Soviet Russia এ-ক্ষেত্রে নূতন পথ দেখাবে; কারণ ১৯৩০-'৩১ সনে যখন "Golden Book of Tagore" (কবির ৭০তম জন্মোৎসবে) প্রকাশ করি, তখন একজন রুশ Composer তাঁর সুরের অর্ঘ্য রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। সেটি আমি ঐ Golden Book-এ ছেপেছি। ১৯২০-'২১ সনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন ইউরোপ ভ্রমণ করি, সে সময়ে Tamara Lubimova! নাম্নী রুশ-Pianist আমার কাছে "মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে" গানটির সুর-সঙ্গতি বাজিয়ে গুরুদেবকে শুনান Paris-এ এবং ঐ গানের সুর বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল রুশ চিত্রকর Nicholas Roerich-কে, যাঁর কাছে আমায় নিয়ে যান বন্ধুবর অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি এবং সুরশিল্পী দিলীপ রায় তখন (১৯২০-'২৩) আমার কাছে প্রায় আসতেন Paris সহরে, যেখানে বহু দেশের শিল্পী ও সুরকারদের কাছে (যেমন, Albert Roussel) রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আলোচনা করেছিলাম। খুব ইচ্ছা

ছিল রম্যা রলাঁক দিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিষয়ে কিছু লেখাব কিন্তু তাঁর "মহাত্মা গান্ধী", "রামকৃষ্ণ" ও "বিবেকানন্দ" জীবনী তিনখানির জন্য মালমশলা যোগাতেই সময় কেটে গেল। শুধু সান্ত্বনা এই যে, গুরুদেবের "বলাকা" বাংলা থেকে ফরাসী মুক্ত-ছন্দে (Free Verse) শেষ উপহার দিয়ে এসেছি ফরাসী কবি P. J. Jouve-এর সাহচর্য্যে।

এতকাল MacMillan প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদ থেকেই বিশ্বের নানা ভাষায় রবীন্দ্র-রচনার অনুবাদ হয়েছে; শুধু কিছু ফরাসী, ইতালীয়, চেক ও সম্প্রতি রুষ ভাষায় মূল বাংলা থেকে অনুবাদ চলছে! তার চেয়ে গভীরতর মিলন হয়তো হবে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে যখন দুই দলের সুরকার শিল্পী ভাষার অনুবাদকে পোঁছে দেবেন ভাষার অতীত সুরলোকে—যেখানে সুরের গুরু রবীন্দ্র-নাথের শাশ্বত আসন। পাশ্চাত্ত্য Harmony বা সুর-সঙ্গতি তার আপন ধারা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আমাদের প্রাচ্য জগতেও যন্ত্র-সঙ্গীতের উপাদান অসংখ্য; তাদের ভিতর দিয়ে যখন দেশী-সুরকার যন্ত্রীরা ভারতের চিরন্তন বাণী প্রকাশ করবেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মাধ্যমে; তখনই সার্থক হবে পূর্ব্ব-পশ্চিম সমন্বয়ের সাধনা। হয়তো, রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী', গল্প ও উপন্যাস যখন বাণী-চিত্রশিল্পের উচ্চ পর্য্যায়ে উঠবে তখন পাশ্চাত্ত্য শিল্পীদল তাদের উপযুক্ত আবহ-সঙ্গীত জোগাতে ভারতেই আসবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখতে: তাঁর 'কাবুলিওয়ালা' ('পথের পাঁচালী'র মতন) দেশী বিদেশী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ও করবে। Film Music-

এর মাধ্যমে রবীন্দ্র সঙ্গীতের বহু প্রসার হবার অবকাশ রয়েছে। ভাষা যারা বোঝে না তারাও অভিনয়ের সঙ্গে খাঁটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত-উপাদানে-গড়া সুরভাষ্যে তাঁর বড় রচনা, বিশেষ তাঁর নাটকগুলি, বুঝতে পারবে।

এ' প্রসঙ্গে মনে পড়ে তাঁর 'ডাকঘর'-এর কথা ; ১৯১২ সনে রচিত এই নাটিকার দিকে নটগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে ১৯১৭ সনে ; যখন তিনি 'বিচিত্রা' ভবনের ছোট ঘরখানিতে নট-শ্রেষ্ঠ শিল্পী গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে এবং নন্দলাল বসুর সাহায্যে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে অপূর্ব্ব প্রয়োগ-বিজ্ঞান দেখিয়েছিলেন। সেবার ক'লকাতা কংগ্রেসের পর ঐ 'ডাকঘর' অভিনয় দেখতে 'বিচিত্রা'-ভবনে এলেন সভানেত্রী Annie Besant মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি এবং তাঁদের সঙ্গে শিশিরকুমার ভাদুড়ী, বিপিনচন্দ্র পালের মত সমঝদারগণ। 'ডাকঘর'-এ গান ছিল না, কিন্তু গান হ'লে নাটকের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছানোর সুবিধা হবে জেনেই প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতায় সুর বসিয়ে গাওয়ালেন, "আমি চঞ্চল হে। আমি সুদূরের পিয়াসী"। ভৈরবীর উদাস করা সুরের পর ঠাকুর্দ্দা পথে বেরিয়ে ধরলেন মেঠো সুর—

"গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে"

দেখলাম সে-সময় গান্ধিজীও মুগ্ধ হয়ে গুরুদেবের সংগীত ও অভিনয় দেখছেন। শেষে মুমূর্ষু বালক অমলের কণ্ঠ নীরব হবার একটু আগে নেপথ্য-সঙ্গীতে বেহালার করুণ

আলাপের সঙ্গে মাতৃকণ্ঠ সবাইকে আকুল করলো শেষ গান—

জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা
জানিগো জানি তা'ও হয়নি হারা
যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা
জানি হে জানি তা'ও হয়নি হারা। *

পটক্ষেপের পর মহাত্মাজি, শ্রীমতী বেশান্ত, সরোজিনী দেবী এসে নটরাজ রবীন্দ্রনাথের হাত দু'খানি ধরে তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন, মনে আছে। আবার এই 'ডাকঘর' নাটকই Paris Radio-তে শুনানো হয়েছিল ১৯৪০ সনে—যখন Hitler-এর আক্রমণে প্যারিসের পতন হ'ল। সে কথা হয়তো রবীন্দ্রনাথ শুনে গেছেন, চিরবিদায়ের আগে। অমর কবির এমনি কত অমূল্য রচনা দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারীর কাছে পেঁছিবে—তাঁদের বিরাট সুরভাষ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়ে গেছেন। তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রের নাটকে "জ্বল জ্বল চিতা" গান প্রথম জুড়েছিলেন; তারপর থেকে কত নাটক, গীতিনাট্য এবং শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নৃত্যনাট্যেও সুরযোজনা করেছেন ৭০ বছর পার হয়ে! ভাষার সঙ্গে ভাব, ছন্দের সঙ্গে সুর কী নিবিড়-ভাবে মেলে, রবীন্দ্রনাথ বহু রচনায় তার অজস্র সার্থক প্রমাণ রেখে গেছেন। সেটি অনুভব করেছেন শান্তিনিকেতনের তথা গীত-বিতান ও দক্ষিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদল—

---

* এই গানটি কবি ২২শে শ্রাবণ, ১৯১০—গীতাঞ্জলি-যুগে লেখেন। যেন তার, 'নির্ব্বাণ'-এর পূর্ব্বাভাষ

যাঁরা কবিগুরুর প্রথম যুগের 'কালমৃগয়া', 'বাল্মীকি-প্রতিভা' থেকে সুরু ক'রে 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি মধ্যযুগের অভিনয় দেখে শেষযুগের 'নটীর পূজা' ও 'চণ্ডালিকা'র অভিনয় নিয়ে ধন্য হয়েছেন।

তাঁর 'শৈশব-সঙ্গীতে' যে কবি আমাদের জাগিয়েছেন, যাঁর 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' শুনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করেন, তিনিই আবার তাঁর নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' মহাত্মা গান্ধীকে কেন উৎসর্গ করেন—এসব ঘটনার তাৎপর্য্য হয়তো ক্রমশ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে। সেই আশায় অতি সংক্ষেপে মাত্র দু'-একটা বিষয়ের আলোচনা করলাম নিজের চোখদুটো একেবারে অস্পষ্ট হয়ে যাবার আগে।